পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানে তারি

গুরু গোবিন্দ সিংহ

(জীবন-বৃত্তান্ত)

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীরামেশ্বর দে
চন্দননগর।

তৃতীয় সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৩৩
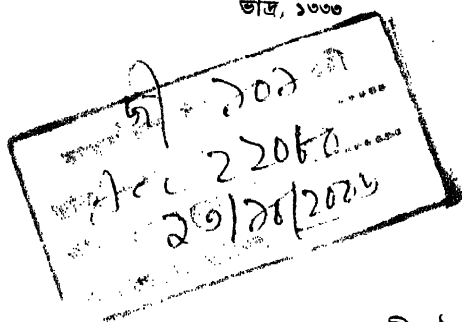
মূল্য এক টাকা]

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৪১।২৬

ভূমিকা

যে সকল সন্তানের জন্য ভারতবর্ষ গৌরব করিতে পারেন, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম ; তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মোন্মাদনা তাঁহাকে অবতার স্বরূপ করিয়াছে। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বাঙ্গলার সকলেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। তাই সকলের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। বিশেষ করিয়া তরুণ যুবকদের জন্য ইহা লেখা। কাজেই ইহা তাহাদের উপকারে আসিলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

গ্রন্থকার—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

গীতা—৯।২৭।২৮

আহার-বিহার, যাগ-যজ্ঞ, চিন্তা-তপস্যা, দান-ধ্যান—ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাহা-কিছুই কর না কেন, হে ভারত! সে-সমস্তই আমাকে লক্ষ্য করিয়া করিও; তাহা হইলেই শুভাশুভ ফলের হাত হইতে, তথা কর্ম্ম বন্ধন হইতে, চিরমুক্তি লাভ করিবে, তুমি আমাময় হইয়া যাইবে, আমাকে পাইয়া ধন্য হইবে।

সূচীপত্র

সতি শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহ

গুরু গোবিন্দ সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখ জাতি

শিখ-অধ্যুষিত পবিত্র পঞ্চনদের সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাকে ভারতবর্ষের জীবনসংগ্রামের প্রথম ও শেষ লীলাস্থল বলা যাইতে পারে। সুদূর কালের যাযাবর আর্য্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শক-হূণ-গ্রীক ও তুর্ক প্রভৃতি সকলেই এই প্রদেশের নৈসর্গিক সম্পদের বাহুল্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য, দক্ষিণে স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র রাজবারা, পূর্ব্বে নিত্যকলনাদিনী যমুনা ও পশ্চিমে অভ্রভেদী সুলেমান পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রদেশ শিল্প ও সাহিত্যে ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মোন্মত্ত কোরাণ-সর্ব্বস্ব তুর্কদিগের অধীন হইয়া অবধি ইহার সে গৌরব একেবারে অস্তমিত হইয়াছে।

দেশ

গুরু গোবিন্দ সিংহ

ভারত-সিংহাসন অধিকার করিয়াই তুর্কেরা ইসলাম প্রচারের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পায়। প্রথম প্রথম, অস্ত্রের ভয় ও নানা প্রলোভনাদি সত্ত্বেও আর্য্যেরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু রাজকার্য্যোপলক্ষে নিরবচ্ছিন্ন রাজভাষার সেবায় লিপ্ত থাকায় এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাবে সংস্কৃত-চর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিবার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ অচিরেই তাঁহারা শিথিল-ধর্ম্ম হইয়া পড়েন। ফলে তখন রাজরোষ অবহেলা করিবার উপযুক্ত নৈতিক সাহস হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় অনেকেই ক্রমে নবধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হন এবং বিলাসমত্ত রাজপুরুষদিগের ন্যায় সংযম হারাইয়া অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন; কিন্তু পঞ্চনদের একমাত্র জলবায়ুর কল্যাণেই তাঁহাদের সেই প্রাচীন বাহুবল নষ্ট হইতে পারে নাই।

পতন

এইরূপে কয়েক শত বর্ষ অতীত হইলে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাত্মা কবীর দেশ-হিত-কল্পে এক নবধর্ম্ম প্রচার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ কতকটা সুগম করিয়া দেন। তৎপরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষত্রিয় বীর বাবা নানক উভয় জাতিকে এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া ধর্ম্মজগতে এক যুগান্তর সংঘটন করেন। তাঁহার চরিত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া বহুতর হিন্দু-মুসলমান তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সব হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া কালে একটি প্রবল সম্প্রদায় গঠিত হয়। তাহাই আজ জগতে নানক-শিষ্য বা শিখ-সম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

সংস্কার

শিখধর্ম্মের উৎপত্তি

গুরু অর্জ্জুন এই নবধর্ম্মের যথোচিত সংস্কারদ্বারা শিষ্যগণের মন

পার্থিবতার প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট করিলে, মোগল রাজন্যবর্গ অন্যায়-ভাবে তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলে গুরুগোবিন্দ সিংহ তাহাদের প্রাণে প্রতিহিংসা-বহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিতে যত্নপর হন এবং প্রবল মোগলের হস্তে পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইলেও হৃতসাহস না হইয়া, মুক্তসর-যুদ্ধে মোগল-শক্তিকে প্রতিহত করিয়া, স্বাধীনতা লক্ষ্মীকে বরণ করেন; কিন্তু এই স্বাধীনতাসুখ স্বল্প-কালমাত্র ভোগ করিতে না করিতেই, মোগলেরা পুনরায় তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন প্রাণভয়ে শিখেরা নগর-গ্রাম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শক্তি সঞ্চয়ে যত্নপর হয়। তাহাদের সেই কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা স্বাধীন শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রাজ-অত্যাচারে শিখধর্ম্মের পরিপুষ্টি

নানক ও তৎপরবর্ত্তী কতিপয় গুরুগণের শিক্ষা প্রভাবে শিখেরা প্রথমতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিলেও, শেষে মোগলের অন্যায় অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া মুসলমানকে বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে শিখে। এক্ষণে আর শিখধর্ম্ম হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন-ক্ষেত্র নহে, তাহা সর্ব্বাংশে হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।

শিখধর্ম্মের পরিণতি

স্বভাব-ক্ষত্রিয় শিখদিগের শারীরিক গঠনপ্রণালী অতীব সুন্দর। তাহাদিগের দেহ-যষ্টি দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও তেজোব্যঞ্জক। দীর্ঘ কেশ, প্রশস্ত বক্ষ ও প্রোজ্জ্বল নয়ন তাহাদিগের প্রধান বিশেষত্ব। তাহারা ক্ষাত্রধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ সর্ব্বদা একটি লৌহাস্ত্র ব্যবহার করে। তাহারা

যেমনই সাহসী গুরুভক্ত ও বিনয়ী, তাহাদিগের বিক্রম এবং কষ্টসহিষ্ণুতাও সেইরূপ অপরিমেয়; বিপদকে তাহারা তুচ্ছ জ্ঞান করে; মৃত্যুর ভ্রূকুটিতে তাহারা কম্পিত হয় না। ধর্ম্মরক্ষার জন্য, গুরু-আজ্ঞাপালনের ও দেশোদ্ধারের জন্য তাহারা অসংখ্যবার অসীম বীরত্বের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। অনাহার ও অনিদ্রায় তাহারা অভ্যস্ত। সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা তাহাদিগের নিকট ঘৃণার্হ। তাহারা সংযত জীবন যাপন করিতেই শিক্ষিত।

শিখের শারীরিক গঠনপ্রণালী ও প্রকৃতি

স্বধর্ম্মপালনে শিখেরা সর্ব্বদাই তৎপর। তজ্জন্য তাহারা যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। লোকসেবা ও দেশোদ্ধার তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। শরণাগতকে ক্ষমা করিবার উপযোগী ঔদার্য্যে তাহারা বঞ্চিত নহে। তাহারা স্ত্রীজাতিকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করে। রমণীদিগের প্রতি অবমাননা তাহারা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহারা স্বীয় জীবন তুচ্ছ করিয়া প্রবল অত্যাচারীর দম্ভ চূর্ণ করত রমণীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। শিখরমণীরাও ইতিহাসে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা শিশু পুত্রদিগকেও বলি দিতে সঙ্কুচিত নহেন। প্রত্যেক কার্য্যে স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইবার জন্য তাঁহারা উৎসুক। তাঁহারা যেমনই সাধ্বী, তেমনই গুরুভক্ত। মোগল রাজন্যবর্গ বন্দী রমণীদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য কতবার কত চেষ্টা করিয়াছেন, শিশুসন্তানের রক্তে মাতৃবক্ষ রঞ্জিত করিয়াছেন, বিলাসের নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহাদিগের সে চেষ্টা

আদর্শ

শিখরমণী

বিফল হইয়াছে। শিখরমণী এরূপ ভীষণ পরীক্ষাতেও স্বীয় সতীত্বরত্ন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গৌরবতিলককে স্বীয় সীমন্ত দেশ ভূষিত করিয়াছেন।

সত্যপ্রিয়তা শিখদিগের চরিত্রের একটি সুমহৎ লক্ষণ। মিথ্যা-ভাষণকে তাহারা অতীব ঘৃণার সহিত ত্যাগ করে। সত্যকথা বলিয়া দেহত্যাগ করিতে এক শিখ ব্যতীত বুঝি আর কেহ কখনও সাহস করে নাই। তাহাদিগের চরিত্রে নীচতার লেশ নাই। ধর্ম্মভাবে তাহারা সর্ব্বদাই উদ্বুদ্ধ। তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্মজীবন যাপনে সমুৎসুক।

সত্যপ্রিয়তা

অতিথিসেবা শিখদিগের একটি অতি প্রিয়কার্য্য। অতিথিসেবার জন্য তাহারা পঞ্জাবের সর্ব্বত্র ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছে। অতিথিকে তাহারা দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার প্রীতির জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেও সঙ্কুচিত নহে। অতিথি নানা দোষে দুষ্ট হইলেও সর্ব্বদা ক্ষমার্হ বলিয়াই তাহাদিগের দৃঢ় ধারণা।

আতিথেয়তা

শিখেরা সমরনিপুণ। তাহাদিগের যুদ্ধনীতি নিতান্ত সাময়িক। যখন যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারা তখন সেইরূপ যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়াছে। যখন তাহারা সংখ্যায় অল্প থাকিত অথবা রাজঅত্যাচারে প্রপীড়িত হইত, তখন তাহারা অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতিকেই শ্রেয় জ্ঞান করিত। আবার যখন তাহারা আপনাকে শত্রুর সমকক্ষ বিবেচনা করিত, তখনই তাহারা শত্রুকে সম্মুখযুদ্ধ দান করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজন্যবর্গ তাহাদিগের প্রতি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করিলে, তাহারা

যুদ্ধনীতি

আত্মরক্ষার জন্য অশ্বারোহণে দ্রুত পলাইতে শিখে ও ক্রমে সুনিপুণ অশ্বারোহী সৈন্য হইয়া উঠে। তাহাদিগের সাহসিকতা ও যুদ্ধনিপুণতার জন্য আজও তাহারা ইংরেজের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

আত্মত্যাগ

শিখ-ইতিহাস আদ্যন্ত আত্মোৎসর্গের ইতিহাস। তাহাদিগের ন্যায় আত্মত্যাগ এক রাজপুত ব্যতীত, বোধ হয়, আর কেহ কখনও করে নাই। তাহারা গুরুর আদেশ আপ্তবাক্যের ন্যায় মান্য করিয়া থাকে। তাহাদিগের চক্ষে গুরুদ্রোহীর ন্যায় মহাপাপী আর নাই। তাহারা ধর্ম্মের জন্য, গুরুর জন্য, দেশের জন্য কতবার আত্মদান করিয়াছে। সে আত্মদান-কাহিনীতে শিখ-ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের এই আত্মত্যাগেই তাহাদিগের সম্প্রদায় অতি অল্পকাল মধ্যে এইরূপ বিস্তৃত ও প্রবল হইয়া উঠে। জগতের প্রতি জাতির ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলেও শিখের সমতুল্য জাতি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব ইতিহাস

১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে * শিখধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক পবিত্র সূর্য্যকুল উজ্জল করিয়া লাহোরের সন্নিকৃষ্ট তালবাণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার কোমল প্রাণে যে ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইলে, অধঃপতিত দেশবাসীর জীবনগতি ভিন্নমুখী করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সদাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার অভিলাষে নানক ষড়ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রী ও দুই পুত্র রাখিয়া সংসার ত্যাগ করত সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার শিক্ষাদান-গুণে ও যুক্তিতর্কে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু-মুসলমান অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—"হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কিছুই নাই—জগতে সকলেই এক। সকলেই সেই অকালপুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্ট। ভক্তিতে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে আরাধনা করে না, সে নরাধম, নরকের কীট।"

নানক

* কোন কোন মতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে বলিয়াও কথিত।

নানকের জীবিতকাল মধ্যেই তাঁহার শিষ্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদিগের ধর্ম্মোন্মাদনা সদা প্রবল রাখিবার অভিলাষে তিনি গুরুপদ বংশগত না করিয়া উপযুক্ত শিষ্য লহনাকে তৎপদ প্রদান করেন। লহনাও কয়েক বৎসর শিখধর্ম্মের সেবা করিয়া ভক্তপ্রধান শিষ্য অমরদাসকে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত করত স্বর্লোকে প্রস্থান করেন। অমরদাসও গুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া দিগ্বিদিকে উপযুক্ত প্রচারকসমূহ প্রেরণ পূর্ব্বক শিখধর্ম্ম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্রচারকদিগের চেষ্টায় শিখেরা ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া উঠে।

লহনা

অমরদাস

চতুর্থ গুরু রামদাস শিখ-সেবার জন্য তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। মোগলপতি আকবর তাঁহার চরিত্র-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হন ও তাঁহাকে অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী কতকটা ভূমি প্রদান করেন। গুরু তথায় বর্ত্তমান অমৃতসর নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। নগর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিলে, তৎপুত্র অর্জ্জুনমল্ল গুরুপদে বৃত হইয়া পিত্রারব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন। দূরদর্শী গুরু বিচ্ছিন্ন শিখদিগকে এক সূত্রে গ্রন্থন পূর্ব্বক তাহাদিগের জীবনগতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতিপয় বিধি প্রণয়ন করেন। শিখ-তীর্থযাত্রীদিগের ও সাধারণ জনবৃন্দের সুচারুরূপ সেবা করিবার নিমিত্ত গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ প্রত্যেক শিখের নিকট হইতেই সামান্য গুরু-কর গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি যে-যে উপায়ে শিখদিগের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন,

রামদাস

অর্জ্জুনমল্ল

সে সকল অবলম্বন করিতে যাইয়াই শিখেরা ক্রমে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। তিনিই প্রথম শিখদিগকে রাজকার্য্য পালনোপায় শিখাইয়া যান। চতুর্থ গুরু রামদাসের আমলে পার্থিবতার প্রতি অজ্ঞাতভাবে শিখদিগের যে লক্ষ্য পড়ে, গুরু অর্জ্জুনের আমলে তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

তৎকৃত সংস্কার

শেষ দশায় গুরু এক অভাবনীয় বিপদে জড়িত হইয়া পড়েন; তাহাতে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। আকবরপুত্র সেলিম "জাহাঙ্গীর" (জগজ্জয়ী) নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর রাজতক্তে আরোহণ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবের কতকাংশ দখল করেন। এই সময়ে গুরু খুসরুকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন ও তাঁহাকে দিল্লীর মহামান্য বাদ্‌সাহ রূপে স্বীকার করিয়া কর প্রদান করেন। দুর্ভাগ্য খুসরুর পতন হইলে তাঁহার অনুচরগণ সকলেই নির্দ্দয়ভাবে হত বা কারারুদ্ধ হয়। বিধিবিপাকে সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের প্রতিও অর্থ ও কারাদণ্ড প্রযুক্ত হয়।

খুসরুর বিদ্রোহে সাহায্য প্রদান

"দাবীস্তান মজাহিব" গ্রন্থপ্রণেতা মৌলবী মোশিন ফণী অর্জ্জুনের প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি বলেন, লাহোরের ভীষণ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া গুরুকে বিষম নিষ্ঠুরতার সহিত নির্য্যাতিত করা হয়। সেই নিষ্ঠুর নির্য্যাতন সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া গুরু কারামধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কারাবাস ও মৃত্যু

অর্জ্জুন-পুত্র হরিগোবিন্দ * ষষ্ঠ গুরুরূপে বৃত হইয়াই শিখসমাজ-

* শিখেরা সাধারণতঃ হ্রস্ব 'ই'কার ও 'উ'কার কতকটা হলন্ত করিয়া উচ্চারণ করেন। এজন্য 'হরিগোবিন্দ' 'হরগোবিন্দ' রূপে এবং 'হরিরায়' 'হররায়' ও 'হরিক্রিষণ' 'হরক্রিষণ' রূপে উচ্চারিত হয়। সেইরূপ 'অর্জ্জুন' শব্দ উচ্চারিত হয়, 'অরজন'।

সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। শিখদিগকে সামরিক শিক্ষা দিবার জন্য তিনি গোবিন্দপুরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মোগলদিগের সৈন্যবিভাগের যাবতীয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার অভিলাষে চতুর গুরু মোগল সেনা-বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। যৎকালে সম্রাট্ কাশ্মীর গমন করেন, তখন হরিগোবিন্দ তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। তথায় সামান্য কারণে সম্রাট্ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং অর্জ্জুনের প্রতি যে অর্থদণ্ড প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে থাকেন ; কিন্তু যথাসময়ে অর্থপ্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় গুরু গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ হন। কয়েক বৎসর স্বল্পাহার ও নানাবিধ নির্য্যাতন ভোগের পর গুরু কোনও উপায়ে শেষে মুক্তিলাভ করেন।

হরগোবিন্দ

মোগল সেনাবিভাগে প্রবেশ

কারাবাস

জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহান সম্রাট্ হইলে, সম্রাট্-পুত্র প্রজাবন্ধু উদারপ্রকৃতি দারা সেকো পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার সহিত হরিগোবিন্দের যথেষ্ট সম্প্রীতি জন্মে ; কিন্তু মোগল-দিগের অন্যায় ব্যবহারে সে বন্ধুত্ব অধিক দিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। মোগলদিগের নিকট পুনঃ পুনঃ অবমানিত হইয়া শিখেরা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ফলে উভয় পক্ষে যে কয়টি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার প্রত্যেকটিতেই বিলাসী মোগল ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ নবশক্তির নিকট মস্তক নত করিতে বাধ্য হয়।

দারা

শিখ-বিদ্রোহ

শিখ-মোগলে প্রথম যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার আপাত কারণ অতি সামান্য হইলেও, তাহার জন্য মোগলেরাই প্রধানতঃ দায়ী।

গুরুকে উপহার দিবার জন্য কোন শিখ দূর দেশ হইতে কয়েকটি অশ্ব আনাইয়াছিল। মোগলেরা সেই অশ্ব অন্যায়ভাবে অপহরণ করিয়া আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। লাহোরের কাজী তাঁহার অংশস্বরূপ যে খঞ্জ অশ্বটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শিখগুরুকে তিনি তাহা সহস্র মুদ্রায় বিক্রয় করেন। গুরু সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া, অশ্ব গ্রহণ পূর্ব্বক মূল্য দিতে অস্বীকার করিলেন ; অধিকন্তু মোগলদিগের একটি শিকারী পক্ষী ধৃত করিয়া রাখিলেন। গুরুর এই অপরাধ অসহনীয় বোধ করিয়া রাজ-সরকার মুখ্‌লুস খাঁর অধীনে গুরুর বিরুদ্ধে সপ্ত সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। গুরুও পঞ্চ সহস্র শিখ সমভিব্যাহারে মোগল সেনাপতির সম্মুখীন হইলে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে মোগলপক্ষ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায়। অতঃপর গুরু ভতিন্দা প্রদেশে গমন করিয়া আরও সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার এক শিষ্য মোগলরাজের অশ্বশালা হইতে দুইটি অশ্ব অপহরণ করিয়া গুরুকে উপহার দেয়। সে কথা জানিতে পারিয়া এবং পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মোগল-সরকার কমরবেগ ও লালবেগকে একদল সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া গুরুর বিপক্ষে প্রেরণ করেন। এবারেও মোগলেরা শিখ-শক্তির গতি প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইয়া যায়। এই যুদ্ধে মোগল-সেনাপতিদ্বয় উভয়েই অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হন।

বিদ্রোহের কারণ

মোগলের শিখ-দমনের চেষ্টা ও পরাজয়

গুরুর ধাত্রীপুত্র ও প্রিয় শিষ্য পৈণ্ডী খাঁর অবিমৃষ্যকারিতার ফলে শিখ-মোগলে পুনরায় এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পৈণ্ডী পাঠান-

কুলসম্ভূত ছিল। গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও তাহার স্বাভাবিক অবিনীত ভাব একেবারে লুপ্ত হইতে পারে নাই। গুরু-পুত্রের একটি সুন্দর শিকারী পক্ষী তাহার গৃহে উড়িয়া যাইলে, সে কৌশলে তাহা ধৃত করে এবং যথার্থ অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়। গুরু সেইকথা জানিতে পারিয়া অন্যায় লোভের জন্য পৈণ্ডীকে তিরস্কার করিলে, মুগ্ধ পাঠান তাহাতে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া দিল্লী গমন পূর্ব্বক মোগল সৈন্যবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করে। মোগলরাজ গুরুর সর্ব্বনাশ করিবার অভিলাষে এই বিশ্বাসঘাতককে সৈন্যাপত্যে বরণ পূর্ব্বক উপযুক্ত সৈন্য সহ শিখের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এইরূপে রাজ-সাহায্য পাইয়া পৈণ্ডী অচিরে গুরুর সম্মুখীন হইলে যে বিষম সংঘর্ষ সংঘটিত হয়, তাহাতে মোগলেরা পর্য্যুদস্ত এবং হতভাগ্য পৈণ্ডী নিহত হয়।

পৈণ্ডী খাঁ

শিখদিগের সামরিক শক্তির উদ্বোধন করিয়া হরিগোবিন্দ দেহত্যাগ করিলে, তদীয় পৌত্র শান্তস্বভাব হরিরায় সপ্তম গুরুরূপে অভিষিক্ত হন। তাঁহার শান্তিপ্রবণতার ফলে শিখের উন্নতি দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে নাই; কিন্তু প্রয়োজনকালে উপযুক্ত সাহস ও কৌশল প্রদর্শনে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। দিল্লীর ময়ূরতক্ত লইয়া রাজপুত্রগণ মধ্যে প্রবল বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, শিখগুরু উদারপ্রকৃতি প্রজাবন্ধু দারা সেকোকে নানা উপায়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন; কিন্তু ভারতলক্ষ্মীর দুর্ভাগ্যক্রমে পক্ষপাতী ঔরঙ্গজেব ভ্রাতৃরক্তে অভিষিক্ত হইয়া তক্ত্ অধিকার করিলে, গুরু তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্ষীণশক্তি শিখ-সম্প্রদায়কে চিরনির্ব্বাণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াস পান।

হরিরায়

হরিরায়ের দেহাবসানের পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র বালক হরিকৃষ্ণ * গদি আরোহণ করেন। তাঁহার গুরুপদে অধিষ্ঠান কালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। তিন বৎসর মাত্র গুরুপদে বিরাজিত থাকিয়া গুরু অকালে বসন্তরোগে দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

হরিকৃষ্ণ

---
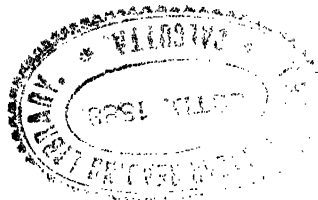
* গুরুমুখী ভাষায় 'ঋ'কার এবং সংযুক্ত বর্ণের প্রচলন না থাকায়, 'হরিকৃষ্ণ' 'হরিক্রিষণ' রূপে লিখিত হয়। আজকাল কেহ কেহ উক্ত ভাষায় সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার করিতেছেন, দেখা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পিতৃ-পরিচয়

শিখগুরু-পদ প্রথমে বংশগত না হইয়া শিষ্যগত ছিল ; কিন্তু কালক্রমে সে প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং চতুর্থ গুরু রামদাসের সময় হইতে এই পদ বংশগত হইয়া উঠে। এইজন্যই রামদাসের পর অর্জ্জুন এবং অর্জ্জুনের পর হরিগোবিন্দ গদি আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। পদটি এইরূপ বংশগত হইয়া যাওয়াতেই শিখদিগের সামরিক অভ্যুদয়ের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ; অন্যথা তাহা চিরকালই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিত।

গুরুপদ

ষষ্ঠ গুরু হরিগোবিন্দ পঞ্চ পুত্রের পিতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গুরুদিত্য এবং মধ্যমের নাম তেগবাহাদুর। পিতার দেহাবসানের পূর্ব্বেই গুরুদিত্য হরিরায় ও ধীরমল নামক দুইটি শিশুপুত্র রাখিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। হিন্দু-সংসারে প্রথম ও কনিষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া গণ্য হওয়ায়, গুরুপদে তেগ বাহাদুরের বিশেষ কোন অধিকারই ছিল না ; সুতরাং হরিগোবিন্দের পর হরিরায় ও তৎপরে তদীয় পুত্র হরিকৃষ্ণ গুরুপদ অধিকার করেন। নির্ব্বংশ অবস্থায় হরিকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিলে, ষষ্ঠ

অধিকার বিচার

গুরুর পূর্ব্ব নিয়োগক্রমে গুরুপদ তেগবাহাদুরেরই প্রাপ্য হয়। হরি-গোবিন্দের এই নির্দ্দেশ গুরুবংশের প্রায় সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। তজ্জন্যই দেহাবসানকালে হরিকৃষ্ণ তেগবাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যান, 'অতঃপর বাবা বকালাই গুরু হইবেন।'

বকালা তেগবাহাদুরের নামান্তর নহে; তাহা বিপাশার তীরে এবং গোবিন্দবালের সন্নিকটে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লী। হরিগোবিন্দ স্বীয় শক্তিবর্দ্ধনের জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন কালে আপনার অনেকগুলি আত্মীয়কে এই পল্লীতে রাখিয়া যান। তদবধি তেগ সেই গ্রামে অবস্থান করিতে থাকেন।

বকালা

কাহাকে লক্ষ্য করিয়া অষ্টম গুরু শেষবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত না থাকিলেও, তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ চারিদিকে বিঘোষিত হইবামাত্র, হরিগোবিন্দের আত্মীয়বর্গ সকলেই গুরুপদ অধিকারের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন; কিন্তু স্বভাবতপস্বী তেগ বাহাদুর তাঁহাদের এরূপ অন্যায় প্রয়াস দেখিয়াও কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার বিনয়াবনত হৃদয় গুরুপদ গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত ছিল না; সুতরাং তিনি পূর্ব্ববৎ নিরুদ্বেগে নির্জ্জন-বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্জ্জন-বাস তাঁহার ললাট-লিপি নহে। কাজেই তিনি স্বয়ং অসম্মত হইলেও, মাখন সাহা সমগ্র শিখ-সমাজের মুখপাত্র হইয়া তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিলেন। তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ মহামান্য পদ অগ্রাহ্য করিবার জন্য নানা যুক্তি দেখাইলেন; কিন্তু শিখদিগের প্রবল আগ্রহের নিকট সে সকল কোথায় ভাসিয়া গেল। বাধ্য হইয়া তেগকে পিত্রাসনে উপবেশন

তেগ বাহাদুর

গুরুপদে অভিষেক

করিতে হইল। হরিগোবিন্দ তেগের মাতার নিকট তেগের ব্যবহারের জন্য যে সকল অস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, অভিষেকের সময় সেই সকল অস্ত্রে তাঁহার পুণ্যদেহ সজ্জিত করিয়া দিলে, তিনি বারম্বার বলিয়াছিলেন—'আমি অযোগ্য ব্যক্তি, আমায় আবার এ ভার কেন?' মহৎ ব্যক্তিরা মহত্ত্বের আবরণে আবৃত থাকায় স্ব স্ব প্রতিভার আদর নিজেরা বুঝেন না—আপনাকে সর্ব্বদাই দীন ও ক্ষুদ্র বিবেচনা করেন!

তেগ গুরুপদ গ্রহণ করিলে, স্বার্থপর আত্মীয়দিগের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকিলে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদিগকে বকালা হইতে দূর করিয়া দিতে অভিলাষী হন; কিন্তু মাখন সাহার পরামর্শে গুরু তাহা হইতে বিরত হইয়া, স্বয়ং বকালা ত্যাগ করত পঞ্জাবের বিভিন্ন অংশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হন।

গৃহশত্রু

বকালা-ত্যাগ

দিল্লী পৌছিতে না পৌছিতেই তাঁহাকে এক অভাবনীয় বিপদে পড়িতে হইল। দুষ্টপ্রকৃতি পৌত্র-সম্বন্ধীয় রামরায় * গুরুপদ অধিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও, সফল-মনোরথ হইতে না পারিয়া তেগের বিষম শত্রু হইয়া উঠেন। সম্প্রতি তেগ কর্ত্তারপুরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ

রামরায়ের ব্যবহার

* রামরায় হরিরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেও মোগলের সঙ্গদোষে বিলাসী ও অসৎকর্ম্মপ্রিয় হইয়া উঠায়, পিতৃকর্ত্তৃক গুরুপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এজন্যই তাঁহার পরিবর্ত্তে তদীয় কনিষ্ঠ হরিকৃষ্ণ অষ্টম গুরুরূপে বরিত হইয়াছিলেন।

করিয়াছিলেন। রামরায় তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া সম্রাটের নিকট তেগের বিদ্রোহ-চেষ্টার অভিযোগ করিলেন। ফলে তেগকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হয়; কিন্তু অম্বরাধিপ রামসিংহের বিশেষ চেষ্টায় তিনি অচিরেই কারামুক্ত হন।

রামসিংহ

অতঃপর গুরু পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়া সুরধুনীবিধৌত পাটনা সহরে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। তথায় অবস্থান কালে, তান্ত্রিক পণ্ডিতদিগের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং ফলে কামরূপ পরিদর্শনের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হন। এই সময় অম্বরাধিপ আসাম যাইতেছিলেন। গুরু এই সুযোগ ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিবারবর্গকে শ্যালক কৃপালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি রামসিংহের সহগামী হন এবং আসামের পবিত্র তীর্থগুলি পরিদর্শন করিয়া ও কামরূপের রাজার সহিত আলাপান্তে সানন্দচিত্তে পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গুরু এই স্থানের শিখদিগের মঙ্গলের জন্য একটি শিখ-বিদ্যালয় ও একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সহরেই অবস্থানকালে, বিক্রম সম্বৎ ১৭২২ অব্দের * পৌষ মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাত্রি শেষ প্রহরে তাঁহার ভুবন-প্রসিদ্ধ যুগপ্রবর্ত্তক পুত্র মহাত্মা গোবিন্দ রায়ের জন্ম হয়। লোক প্রস্তুত না হইলে,

পাটনায় অবস্থান

আসাম পরিদর্শন

হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান

যুগাবতারের আবির্ভাব

* প্রায় সকল ঐতিহাসিকই গোবিন্দের জন্মবর্ষ নির্ণয়ে ভ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দের জন্ম হয়; কিন্তু শিখদিগের গ্রন্থসমূহে যে তারিখ দৃষ্ট হয়, গ্রন্থমধ্যে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের মতে গোবিন্দের জন্ম ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষ মাসে অথবা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম মাসে সংঘটিত হয়। ১৭২২ সম্বৎ=১০৭২ বঙ্গাব্দ।

মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় না। তাঁহার আবির্ভাবের জন্য লোক প্রস্তুত করিতে যাইয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণকে মোগলের নিকট অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হইতে হইয়াছিল। গোবিন্দ সদাকাঙ্ক্ষ-ক্ষুব্ধ শিখ-হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের যে উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের হৃদয়ে জাগরূক ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শৈশব

মানবের শৈশব ক্রীড়াদি হইতেই তাহার ভবিষ্যতের সূচনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরকালে যে যেমন ভাবে জীবন যাপন করিবে, এই সময় হইতেই যেন সে তাহা আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই শিক্ষা করিতে থাকে। শ্রীবুদ্ধ উত্তরকালে যে পরদুঃখকাতরতার প্রভাবে সুখের সংসার ত্যাগ করিয়া, কঠোর সন্ন্যাসকে বরণ করিয়া লন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি ত্রুটি সংস্কার করিয়া জগতের সমক্ষে নূতন আদর্শ স্থাপন করেন, সেই মহান্ ভাব শৈশবেই তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল। যে মহাত্মার নাম করিলে, আজিও চীনবাসীরা সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে, যাঁহার অধ্যবসায়, প্রতিভা ও নৈতিকতার প্রভাবে চীনের ধর্ম্ম-সংশয় দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, সেই বীরপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক হুয়েন সাঙ্ অতি শৈশবেই তাঁহার মহদ্‌গুণরাশির পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার চরণপ্রান্তে বসিয়া মানুষ কি করিয়া মানুষ হয়, তাহা তিনি অতীব সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহার প্রতাপ ও স্বাধীনতাস্পৃহার নিকট দুর্দ্ধর্ষ

শৈশব ও ভবিষ্যতের সম্বন্ধ

মোগল সম্রাটকেও মস্তক নত করিতে হইয়াছিল, পশ্চিম ভারতের অধঃপতনের যুগে যিনি আত্মত্যাগের মহান্ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসীপ্রবর মহারাণা প্রতাপসিংহও শৈশবে স্বদেশপ্রীতি, সংযম ও দৃঢ়প্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

শিক্ষাই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে। শৈশবে মানবের যে গুণরাশির পরিচয় পাওয়া যায়, সৎসঙ্গ ও সৎশিক্ষা পাইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং কালে তাহাকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলে। আবার উপযুক্ত শিক্ষা ও সঙ্গের অভাবে সেই গুণরাশি অনেক সময়েই নষ্ট হইয়া যায়,—ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই অসহ্য তাপদগ্ধ বা কীটদষ্ট হইয়া শুকাইয়া যায়। বালক শিবজী শিকারপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া দস্যুদলের সহিত মিলিত হন এবং তাহাদের সাহচর্য্যে আত্মগোপন-কৌশল ও ক্ষিপ্রগতি সম্যক্ শিক্ষালাভ করেন ; কিন্তু দাদোজী কোণ্ড-দেবের ন্যায় শিক্ষক না পাইলে, তাঁহার প্রকৃতি কখনও উন্নতগামী হইত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দাদোজী শিশুর কোমল প্রাণে স্বদেশপ্রীতির ও স্বাধীনতাস্পৃহার যে বীজ রোপণ করিয়া যান, তাহারই প্রভাবে তাঁহার দস্যুতা লুপ্ত হইয়া দেশোদ্ধারার্থ মহান্ গুণরাশির আবির্ভাব হয়। তারপর মহাত্মা রামদাস স্বামীর শিক্ষায় তাঁহার শিক্ষোন্মুখ হৃদয়ে প্রকৃত সন্ন্যাস ও নিষ্কামতা জন্মিয়া তাঁহাকে অবতার-স্বরূপ করিয়া তুলে।

সঙ্গ ও শিক্ষা

শিশু গোবিন্দ তাঁহার শৈশব ক্রীড়াদিতেই ভবিষ্যৎ গুণরাজির যথেষ্ট আভাস দিয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে আপনাকে যে মহান্ যজ্ঞের বলিরূপে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন, এই শৈশব হইতেই তিনি

আপনাকে সেইজন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। শিশু নাপলেয়ঁ (Nepoleon) যেমন বরফের গোলা বা পিত্তলের কামান লইয়া খেলা করিতে করিতে আপনাকে ভবিষ্যৎ দিগ্বিজয়ের জন্য শিক্ষিত করিতেছিলেন, সেইরূপ শিখগুরু গোবিন্দও ক্রীড়াচ্ছলে আপনাকে গুরুপদের উপযোগী করিয়া তুলিতে-ছিলেন। তিনি কখন সাধারণ শিশুর ন্যায় কেবল 'ছুটাছুটি' প্রভৃতি ক্রীড়াতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। সমবয়স্ক শিশুদিগকে লইয়া গোবিন্দ 'বাদ্‌শাহ্‌-বাদ্‌শাহ্‌' খেলিতে বড়ই আমোদলাভ করিতেন। তাহদিগকে সেনা করিয়া আপনি স্বয়ং অশ্বারোহণে সেনাপতি বা বাদ্‌শাহের ন্যায় তাহাদিগের চালনা করিতেন, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, আত্মগোপন করিতে শিখাইতেন। কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর লইয়া লক্ষ্য স্থির করিতেন, গুল্‌তি লইয়া পক্ষী বধ করিতে চেষ্টা করিতেন, কখন বা ক্ষুদ্র কামান লইয়াই খেলা করিতেন ; আবার কখন বা বন্দুক ছুঁড়িবারও অভিনয় করিতেন। উচ্চস্থানকে সিংহাসন করিয়া কখন বা তদুপরি বাদ্‌শাহ-ধরণে উপবিষ্ট হইয়া পাত্রমিত্রসহ মন্ত্রণা করিতেন। আবার কখন বা গুরু-দরবারের ন্যায় দরবার সাজাইয়া সঙ্গিগণ-সহ তথায় শাস্ত্রালোচনায় রত হইতেন, তাহাদিগকে গুরুর ন্যায় নানা ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। ইহার ঠিক দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে নবদ্বীপেও একটি শিশু এইরূপে ধর্ম্মাভিনয় করিতেন। তাঁহার সেই ধর্ম্মাভিনয়ই কালে তাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল।

গোবিন্দের বাল্যলীলা

বাদ্‌সাহী ক্রীড়া

গুরুগিরি খেলা

গোবিন্দ শৈশবে যেরূপ চপল, সেইরূপ তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার আত্মসম্মান-জ্ঞান সেই অতি শৈশব হইতে স্ফুরিত হইতে

থাকে। তিনি কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অন্যায় করিতেন না, ঘটনাক্রমে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলে বড়ই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেন। যে কার্য্য তাঁহার অন্যায় বলিয়া বোধ হইত না, তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা অনেক সময় কষ্টকর হইয়া উঠিত। এজন্য কখন কখন তিনি সকলের নিষেধসত্ত্বেও আপনার মতে ভাল বুঝিয়া অন্যায় করিয়া বসিতেন। জলবাহীর কলসী ভঙ্গ করা তাঁহার ঐরূপ একটি দোষ ছিল। কোন ব্যক্তিকে মৃৎকলসে করিয়া জল আনিতে দেখিলে, গোবিন্দ গুল্‌তির আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেন। ভগ্ন কলস হইতে জল পড়িয়া বাহককে অভিষিক্ত করিয়া দিত, তাহা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত। বাহক কিন্তু গোবিন্দের এইরূপ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মাতার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিত। মাতা সন্তানকে এইরূপ দুষ্টভাব ত্যাগ করিতে বারম্বার উপদেশ দিয়া পাত্রের মূল্য প্রদানপূর্ব্বক অভিযোক্তাকে তুষ্ট করিতেন।

গোবিন্দের আত্মসম্মান জ্ঞান

উপদ্রব

একবার গোবিন্দ এইরূপ চাপল্যবশতঃ একটি রমণীর কলসী লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলে, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, কলসী স্পর্শ না করিয়া, রমণীর ললাটদেশ বিদ্ধ করিল। ললাট ভেদ করিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার এরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এবং তাহাতে রমণীকে আহত হইতে দেখিয়া, গোবিন্দ 'মরমে মরিয়া' গেলেন। তিনি জননীকে মুখ দেখাইতে সাহসী না হইয়া, গৃহচ্ছাদে লুকাইয়া রহিলেন। রোরুদ্যমানা রমণী গুরুগৃহে যাইয়া গোবিন্দের মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলে,

লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি

তিনি কাতর হইয়া তাহার যথাবৎ শুশ্রূষা করিলেন এবং রমণী একটু সুস্থ হইলে, তাহাকে অর্থাদি দানে তুষ্ট করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

রমণীটি মুসলমানবংশীয়া। সে সময় মোগল কাজিদিগের অখণ্ড প্রতাপ। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, যে-কোন হিন্দু কাফেরকে নানারূপ বিপদে ফেলিয়া মোগলশক্তির ইস্‌লামপ্রিয়তা প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কাজেই গোবিন্দের মাতা পুত্রের এরূপ ব্যবহারে বিষম ভীতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্যই রমণী চলিয়া যাইতে না যাইতে, তিনি পুত্রের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করিতে লাগিলন—'মুসলমান রাজ্যে বাস করিয়া মুসলমানীকে প্রহার! এরূপ সাহস ভাল নয়। এ কথা যদি কোনক্রমে প্রকাশ পায়, তবেই সর্ব্বনাশ!'

মাতার তিরস্কার

গৃহচ্ছাদ হইতে গোবিন্দ মাতার এই তিরস্কার শুনিতে পাইলেন। এ তিরস্কারে তুর্কশক্তিকে প্রবল বলায়, গোবিন্দের তাহা সহ্য হইল না, তাঁহার সমস্ত সঙ্কোচ সহসা লুপ্ত হইয়া গেল, তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'ক্যা মৈঁ তুর্কসে ডর পাঙ্গ?'—কি! আমি তুর্ককে ভয় করি?

গোবিন্দের তেজস্বিতা

আর একদিন, একজন আমীর পাটনা সহর পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তাহারই একপার্শ্বে শিশু গোবিন্দ সঙ্গীদিগের সহিত ক্রীড়ামত্ত ছিলেন। আমীরকে আসিতে দেখিয়া পথিপার্শ্বস্থ জনবর্গ একটু সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। লোকের এরূপ জড়সড় ভাব ও আমীরের

আমীরের নগর ভ্রমণ

জাঁকজমক দেখিয়া গোবিন্দ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অপর শিশুরাও হাসিয়া উঠিল। শিশুদের এইরূপ বেয়াদবী দেখিয়া আমীর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি পার্শ্বচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ঐ বাঁদরমুখোরা কি বলিতেছে?' গোবিন্দের কর্ণে নবাবের এই কটূক্তি তীব্রভাবে আঘাত করিল। এইরূপ অপমান তাঁহার আদৌ সহ্য হইল না। তিনি সরোষে বলিয়া উঠিলেন—'এই দেখ, এ বাঁদরের মুখ নয়। আজ অন্ধ হইয়া যাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ, সেই কালে বীর হইয়া তোমাদের তেজ নষ্ট করিবে।' পার্শ্বচরেরা শিশুর কথা বলিয়া আমীরকে শান্ত করিলেন, আমীরও লজ্জায় কিছু না বলিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দের চপলতা

এই সকল ঘটনায় গোবিন্দের শৈশবসুলভ চপলতা যতই ফুটিয়া উঠুক না, তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজোরাশিরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গোবিন্দের পিতামহী, ষষ্ঠগুরু হরিগোবিন্দের সহধর্ম্মিণী নানকী পৌত্রের এইরূপ মানসিক তেজের আভাস পাইয়াই সর্ব্বদা বলিতেন—'গোবিন্দ বংশের ধারা রাখিবে।' তিনিই গোবিন্দের শৈশবগুরু। তাঁহার শিক্ষা ও উত্তেজনায় গোবিন্দের তেজোরাশি ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তিনি প্রত্যহই গোবিন্দকে নিকটে বসাইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্ব, ধর্ম্ম-প্রাণতা, স্বার্থত্যাগ ও অতিথিবাৎসল্য প্রভৃতি গুণের কাহিনী-সমূহ অতীব সরস ভাষায় বর্ণনা করিতেন। সেই সব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে গোবিন্দের শিশুপ্রাণে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। গুরুদিগের মত হইবার জন্য তাঁহার প্রাণে বড়ই ব্যাকুলতা

পিতামহী

জন্মিত। পিতামহী তখন গল্প করিয়া দেশের সুখ-দুঃখের কথা শুনাইতেন, মোগলের অত্যাচারে শিখ-সমাজের লাভ-ক্ষতির বিচার করিতেন, গোবিন্দের পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে মোগলের নিকট কিরূপ অন্যায় ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহা করুণস্বরে বর্ণনা করিতেন। এইরূপে তিনি সৎশিক্ষা দ্বারা গোবিন্দের অস্ফুট ভাবগুলিকে জাগাইয়া তুলিতেন, যাহাতে গোবিন্দ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেন এবং পরিণামে যাহাতে তিনি বংশের সম্মান বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন, তাহার জন্য তাঁহাকে নিয়ত উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার এইরূপ শিক্ষাদান-গুণেই গোবিন্দ ভবিষ্য জীবনে স্বীয় পদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বংশগৌরব বৃদ্ধি করত জগতিতলে এক মহতী কীর্ত্তি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পিতামহীর শিক্ষকতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তেগ বাহাদুরের আত্মত্যাগ

পুত্রমুখ দর্শন করিয়া তেগ বাহাদুর অচিরেই পাটনা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্জাব যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি দিল্লী সহরে উপস্থিত হইলে, ক্রূরবুদ্ধি রামরায় আবার অনিষ্ট বিধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা পায়; কিন্তু তেগ পূর্ব্বাহ্নে তাহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, সত্বর সে পাপপুরী ত্যাগ করিলে, তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

পঞ্জাব যাত্রা

পঞ্জাবে আসিয়াই গুরু কহলুর-রাজের নিকট হইতে পঞ্চশত মুদ্রা বিনিময়ে "দেশমখো" নামক একটি গ্রাম ক্রয় করিয়া তথায় মুখওয়াল (বা মুখবাল) নামক একটি বৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নগরই পরে আনন্দপুর বা আনন্দপুর-মুখওয়াল নামে পরিচিত হইয়া উঠে। তেগবাহাদুরের চেষ্টায় মুখওয়াল অল্পদিন মধ্যেই শিখদিগের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। ইতিপূর্ব্বে কর্ত্তারপুরে শিখদিগের একটি দুর্গ ছিল। শিখশক্তি-বর্দ্ধনের জন্য তেগ মুখওয়ালে আর একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

মুখওয়াল

এই সময় দিল্লীর সিংহাসনে মোগলবংশের শেষ সূর্য্য ঔরঙ্গজেব

অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতিরিক্ত ধর্ম্মান্ধতার ফলে সম্রাট্ তদীয় হিন্দু-প্রজাবর্গের মন অত্যন্ত বিষাক্ত করিয়া তুলেন। মোগলবংশের প্রতি দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার ব্যবহারে সকলের হৃদয় হইতেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সকলেই তখন মনে-প্রাণে হিন্দুরাজত্বের কামনা করিতে থাকে। এই সাধারণ ভাব-তরঙ্গ হইতে তেগের হৃদয়ও মুক্তি পায় নাই। পুরুষপরম্পরাক্রমে মোগল রাজন্যবর্গের হস্তে পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইয়া, গুরু মোগল রাজত্বের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়া-ছিলেন, উদীয়মান শিখশক্তি নষ্ট করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব। তিনি আরও ভাবিয়া দেখিলেন, মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ ব্যতীত শিখশক্তির প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। কিন্তু সে উচ্ছেদসাধনে যে শক্তির প্রয়োজন, শিখ-সমাজের তাহা নাই। তজ্জন্যই তিনি শিখদিগকে সমরনিপুণ করিবার অভিলাষী হইয়া তাহাদিগকে আত্মগোপন-নীতি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত ও পঞ্জাবের রাজধন লুণ্ঠন করিতে যত্নপর হন। আদম হাফেজ নামক এক মুসলমান ফকিরও কোন কারণে রাজদ্রোহী হইয়া গুরুর সহিত যোগ দিলেন। উভয়ে মিলিয়া ধনী প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনীরাও বাধ্য হইয়া কর দিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, তাহার অধিকাংশই দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখ বিমোচনের জন্য দান করিতেন। তাঁহাদিগের এই সকল কার্য্যে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃগণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা শিখ-শক্তি দমন করিবার উদ্দেশ্যে এক

ঔরঙ্গজেব

শিখগুরুর পার্থিবলক্ষ্য

আদমহাফেজ ও গুরুর রাজদ্রোহ

প্রবল বাহিনী প্রেরণ করিলে, উভয় পক্ষে এক ভীষণ সংঘর্ষ হইল। তাহাতে শিখেরা পরাজিত ও তাহাদের অনেকেই বন্দীকৃত হইল। আদম হাফেজকে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। তেগ বাহাদুর আত্মগোপন করিয়া রহিলেন।

শিখ-মোগলে সংঘর্ষ

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে কয়েকজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ মোগলদিগ-কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া গুরুর শরণাপন্ন হইলেন। এই সময় সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব কাশ্মীরবাসীদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় তদানীন্তন সুবাদারকে উপদেশ করিয়াছিলেন—হিন্দুগণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে, তাহারা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না; প্রকৃত সুখের সহিত স্বর্গবাস করিতে কেবল এক মহম্মদপন্থীরাই অধিকারী; অতএব সুবাদার অতি অবশ্য তথাকার ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়গণকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া প্রথমে মিষ্টভাষায় বুঝাইবেন, এবং সেইসঙ্গে নানা প্রকার কর স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাগণকে দরিদ্র করিয়া আনিবেন; পরে তাহাদিগকে নানারূপ প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন। যদি এইরূপ অমোঘ উপায়ও ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক ধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টা করা সুবাদারের একান্ত কর্ত্তব্য। মুগ্ধ সম্রাট্ প্রকৃতিবৃন্দকে নানা উপায়ে উৎপীড়িত করিয়া, দুর্ভিক্ষের করাল-গ্রাসে নিষ্পেষিত করিয়াও ধর্ম্মপ্রচার করিতে উৎসুক ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া সমাজরক্ষক নিরুপায় ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার জন্য তেগ বাহাদুরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ক্ষণিক চিন্তার

কাশ্মীরে ঔরঙ্গজেবের উপদ্রব।

পর সদ্‌গুরু সকল দায়িত্ব স্বীয় মস্তকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উপদেশ মত ব্রাহ্মণগণ দিল্লী যাইয়া সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, যদি তিনি গুরু তেগ বাহাদুরকে ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, তবে সমগ্র কাশ্মীরবাসী অচিরাৎ মুসলমান হইতে স্বীকৃত আছে। এই কথা শুনিবামাত্র সম্রাট্‌ তেগকে রাজদ্বারে আহ্বান করিলেন। তেগও সে আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

শিখগুরু ও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ।

গমনকালে গুরু পাটনা হইতে গোবিন্দকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি পাতিয়ালা পরিভ্রমণ করিয়া ধীরে ধীরে দিল্লী অভিমুখে চলিলেন। গোবিন্দও পিতার আজ্ঞা পাইবামাত্রই সত্বর পঞ্জাব যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইলে, * পিতা পুত্রকে বলিলেন,—"বৎস! বাদ্‌সাহের নিকট হইতে আমার মৃত্যুর আহ্বান আসিয়াছে। সেখানে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে সেজন্য তুমি দুঃখিত হইও না। আমার মৃত্যুর পর তুমিই গুরুপদ পাইবে। কিন্তু বৎস! দেখিও আমার দেহ যেন শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য না হয়। পিতৃহত্যার কথা ভুলিও না। আমার মৃত্যুতে যে রক্তপাত হইবে, সে রক্তের প্রতিশোধ লইতে কখন বিস্মৃত হইও না।" অতঃপর গুরু তাঁহাকে পিতা হরিগোবিন্দের অস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া ভবিষ্য গুরুপদে বরণ করিলেন। বলাবাহুল্য, তেগ আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পিতাপুত্র

গুরু দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে

* কেহ কেহ পিতাপুত্রের এই সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করেন না।

দীক্ষিত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পান; কিন্তু গুরু কোনক্রমেই বিচলিত হইলেন না দেখিয়া, সম্রাট্ তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাঁহাকে জানাইলেন—ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই তিনি মুক্তি পাইবেন। কারাগারে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতিত করা হয়। পরে কয়েক দিন এইরূপ কারাবাসের পর তেগ বাহাদুর বাদসাহ সভায় নীত হইলেন। তথায় তাঁহাকে নানারূপ কঠোর বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে যাদুকর বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন, বলিলেন—"আমাদের কয়েকটি যাদু দেখাও।" তেগ বাহাদুর গম্ভীরভাবে বলিলেন—"যাদুর সহিত ধার্ম্মিকদিগের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহারা সত্য জানেন, সত্যপথে চলেন।

কারাবাস

নাটক চেটক করত অকাজা।
প্রভু লোগনকো আবত লাজা॥

—নাটকাদির ন্যায় বৃথা কার্য্যে সাধুদিগের চিত্ত স্বতঃই লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠে।"

অতঃপর ঔরঙ্গজেব তেগের ও শিখদিগের গুপ্ত উদ্দেশ্য জানিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন গুরু গলদেশে ঝুলান একখণ্ড কাগজ দেখাইয়া বলিলেন—"ইহাতেই সমস্ত লিখিত আছে। ইহা কাটিয়া লও।" পরে বাদসাহের আদেশে প্রকাশ্য বাজারে শিখগুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হয়। * কাগজে কি আছে,

সম্রাটের আজ্ঞায় শিখগুরু হত্যা

* ১৭৩২ বিক্রম সম্বতের (১৬৭৫ খৃঃ) অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়।

সোৎসুকে তাহা পড়িতে যাইয়া ঔরঙ্গজেব দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

"শির দিয়া পর সার ন দিয়া।"

—শির দিলাম, কিন্তু গুহ্য বিষয় দিলাম না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অভিষেক

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে গুরু তেগ বাহাদুর প্রিয়পুত্র গোবিন্দ রায়কে গুরুপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য জনৈক বিশ্বস্ত শিখের সহিত একটি নারিকেল ও পাঁচটি পয়সা প্রেরণ করেন। শিখ ও রাজপুতদিগের নিকট নারিকেল অতি পবিত্র দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সকল শুভকর্ম্মেই তাহারা ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। শিখগুরুগণের অভিষেকের নানা উপচারের মধ্যে একটি নারিকেল ও পাঁচটি পয়সা সর্ব্বপ্রধান। নিয়োগকর্ত্তা অভিষেচ্য ব্যক্তিকে স্বয়ং বা প্রতিনিধিদ্বারা উক্ত দ্রব্যসমূহ প্রদান করিলে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অভিষেকের পরিচয়

অভিষেকের উপচার সহ শিখদূত নবগুরুর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তেগ বাহাদুরের পবিত্র শির স্কন্ধচ্যুত হয়, গোবিন্দ সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রথমে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন। পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের বাণী স্মরণ করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—"গুরু মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য

গোবিন্দের প্রতীক্ষা

ফলিবে। * আমি গুরু-হত্যার প্রতিশোধ লইবই। আমি তুর্কের মূলদেশ পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিব।”

তাঁহার অধীরতা দর্শন করিয়া তদীয় মাতা ও পিতামহী আপনাদিগের হৃদয়ভেদী শোক চাপা দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, গোবিন্দ এই বীভৎস কাণ্ডকে বিধিনির্দ্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন।

গুরু-মুণ্ড

গুরুভক্ত মাখন সাহার কৌশলে তেগ বাহাদুরের দেহ শৃগাল-কুক্কুরের হস্ত হইতে কোনক্রমে রক্ষা পায়। জনৈক রঙ্গরেটে বংশীয় চণ্ডালকে দিয়া তিনি তখন সংগোপনে গুরুমুণ্ড গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করেন। † সেই মুণ্ড দর্শন

* নানক ও তৎপরবর্ত্তী গুরুরা প্রায়ই বলিতেন, সাধু ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কষ্টপ্রদান করিলেই তুর্কশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং সপ্তজন সাধুর হত্যায় তুর্করাজ্যের অধঃপতন হইবে। মোগলের অন্যায় ধর্ম্মান্ধতার ফলে ইতিমধ্যেই বহু সাধু ব্যক্তি নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিখদিগের দুইজন গুরুও তাঁহাদের ক্রোধোদ্দীপ্ত করিয়া নিহত হন।

† ঔরঙ্গজেব গুরুদেহের কোনরূপ সৎকারের বন্দোবস্ত না করিয়া দিল্লীর চাঁদনীচকের রাস্তার মধ্যখানে ফেলিয়া দেন। যাহাতে কেহ উক্ত শবের কোনরূপ সৎকার না করে, সেজন্যও কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। লুবাণা বংশীয় লক্ষ্মী নামক জনৈক গুরুভক্ত শিখ “ঠেকেদার” সেই দিন দিল্লীর দুর্গমধ্যে ইষ্টক ও চূর্ণ প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিবার সময় লক্ষ্মী মাখনসাহের গুপ্ত নির্দেশ মত গুরুর মুণ্ডশূন্য দেহ আপনার গো-শকটের মধ্যে লুকাইয়া দ্রুত পলাইয়া যান এবং গৃহমধ্যে চিতা সজ্জিত করিয়া গুরুদেহ স্থাপন করেন। পাছে মোগলেরা গুরুদেহের সৎকারের কথা জানিতে পারে, এই ভয়ে তিনি গুরুদেহের সহিত আপনার গৃহখানিতেও অগ্নি প্রদান করেন। পরবর্ত্তী কালে শিখেরা সেই ভস্মীভূত গৃহের ভিত্তির উপর একটি সুন্দর ‘মন্দির’ বা ‘দহরা’ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই উক্ত স্থান ‘রিকাবগঞ্জ’ নামে সাধারণে প্রখ্যাত হইয়াছে।

করিয়া গোবিন্দের ক্রোধ পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন—

'সাধু ন হেত অতি জিন করী।
শীশ দিয়া পর সী ন উচরী॥
ধরম হেত শাকা জিন কিয়া।
শীশ দিয়া পর শিরহ ন দিয়া॥

—সাধু ব্যক্তি অকারণে দেহত্যাগ করিলেও অনুতাপ করেন না। তিনি ধর্ম্মের জন্য সমস্তই করিয়াছেন। তিনি শির দিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্ম দেন নাই।'

গুরু-মুণ্ডের সংকার

তারপর গোবিন্দ যথারীতি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিলেন। যে স্থলে গুরু-মুণ্ডের সৎকার হয়, সেই স্থলে আজও গোবিন্দ-নির্ম্মিত একটি মনোরম 'দহরা' বা মন্দির বিরাজ করিতেছে। কত শিখ তথায় গমন করিয়া শিখগুরুগণের গুণগান করিতে করিতে আপনাদিগের মনঃ-প্রাণ পূত ও জীবন সার্থক করিয়া থাকে।

অভিষেক

শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে, শিখদিগের আগ্রহাতিশয্যে এবং মাতা গুজরী ও পিতামহী নানকীর সম্মতিক্রমে গোবিন্দের অভিষেকের উদ্যোগ হইতে লাগিল। এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শিখগণ নানাবিধ উপঢৌকন সহ গুরু দরবারে উপস্থিত হইল। গুরুও তাহাদিগকে পরম স্নেহ ও যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ প্রচার করিয়াছিলেন—'এক্ষণে অন্যবিধ উপহার অপেক্ষা গুরুকে উত্তম অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদির উপহার প্রদান করিলে, গুরু অধিকতর প্রীত হন।'

তাঁহার এই বাণী শ্রবণ করিয়া গুরুভক্ত শিখেরা স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে অশ্ব, তরবার, বর্ষা, কিরিচ, কুঠার বা করাত প্রভৃতি বহুবিধ প্রীতিকর উপহার লইয়া গুরুর অভিষেকোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিল। গুরু সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগের প্রত্যেকের দান অতীব আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বহস্তে তাহাদের উপহার গ্রহণ করায়, শিখগণ অত্যন্ত শ্লাঘা অনুভব করিতে লাগিল এবং স্ব স্ব জীবন সার্থক বিবেচনা করিয়া পরম পুলকিত হইল। গুরুর প্রশংসায় তখন চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল। এইরূপে শিষ্যহৃদয় জয় করিয়া গোবিন্দ দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহাসমারোহের সহিত গুরু-গদিতে আরোহণ করিলেন।

শিষ্যদিগের উপহার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সাধনা

পিতার মৃত্যুতে গোবিন্দের হৃদয়ে যে তীব্র আঘাত লাগে, তাহাতেই তাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাঁহার সেই দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য অচিরেই দূরীভূত হইয়া তাঁহাকে শান্ত ও চিন্তাশীল করিয়া তুলে। যে কালে একমাত্র ক্রীড়াতেই বালকগণের মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট থাকে, তখনই তাঁহার হৃদয়ে বিষাদের ঘন মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাকে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যুক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। হৃদয়-বৃত্তির গাঢ়তা প্রযুক্তই তাঁহার বহিঃচাঞ্চল্য ক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল। স্বীয় বলহীনতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তিনি আপনাকে শত্রুর সমকক্ষ করিয়া তুলিবার অভিলাষে যমুনা-তীরস্থিত গিরি-প্রদেশে যাইয়া নির্জ্জন সাধনায় আপনাকে সমাহিত করিলেন।

প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন

এই নির্জ্জনবাসকালে গোবিন্দ রায়ের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। * এই উপলক্ষে তিনি কয়েকটি মহোৎসব সংঘটন করিয়া

* গোবিন্দের তিন স্ত্রী। তাঁহাদের নাম (১) মাতা জীতোজী, (২) মাতা সুন্দরণজী বা সুন্দরীজী, (৩) মাতা সাহিব দিবান। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৪৩ বিক্রম সম্বতের মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে) মাতা সুন্দরীজীর গর্ভে অজিত

দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান ধ্যানে তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া শিখেরা তাঁহার প্রতি ক্রমেই অধিকতর অনুরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

উদ্বাহ

এই সময় সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব ও স্বার্থান্বেষী রামরায় তাঁহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ বিশেষ চাতুর্য্য সহকারে কার্য্য করিয়া আপনাকে সমস্ত বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিতেন।

সম্রাট্ ও রামরায়

মাতুল কৃপালের অভিভাবকতায় গোবিন্দ শিখদিগের দস্যুবৃত্তি দমন করিয়া তাহাদিগকে সংযত জীবন যাপনে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। দস্যুতা না করিয়াও যাহাতে তাহারা সমরনিপুণ হইয়া উঠে, এজন্য তিনি সর্ব্বদা মৃগয়ার ছল করিয়া গভীর আরণ্য প্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতেন। কখন কখন বা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজগণের সহিত দুই একটি খণ্ড যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

শিখদিগের যুদ্ধশিক্ষা

কেবল এইরূপ মৃগয়াতেই সমস্ত সময় ক্ষেপণ না করিয়া, গোবিন্দ অবসর মত সংস্কৃত, পারস্য ও দেশজ ভাষা অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন।

সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। পরে মাতা জীতোজীর গর্ভে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে (১৭৪৭ বিক্রম সম্বতের চৈত্র মাসে) জুঝার সিংহ, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৫৩ বিক্রম সম্বতের অগ্রহায়ণ মাসে) জোরাবর সিংহ এবং ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে (১৭৫৫ বিক্রম সম্বতের ফাল্গুন মাসে) ফতে সিংহ (ফতহ সিংহ) জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা সাহিব দিবানের কোন সন্তান ছিল না। এজন্য গোবিন্দের নিয়োগক্রমে তিনি সমগ্র শিখসমাজের জননী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। কোন কোন মতে সাহিব দিবানের সহিত গুরুজীর সনাতন বিধান অনুযায়ী বিবাহ হয় নাই।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শত্রু তুর্কদিগেরও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। দেশের প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিত। দেশবাসিগণের অপূর্ব্ব বীরত্ব-গাথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত; কিন্তু ক্ষণপরে আবার তাহা দেশবাসীর বর্ত্তমান দুরবস্থা ও অধঃপতন স্মরণ করিয়া শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত; কিন্তু নৈরাশ্য কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। চেষ্টা করিলে দেশের গতি ভিন্নমুখী করা যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে এ ভাব তাঁহার প্রাণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

শাস্ত্রালোচনা

দেশের অবস্থা

এইরূপে কিঞ্চিদধিক বিংশ বর্ষকাল নীরব সাধনা করিয়া গোবিন্দ দেশোদ্ধার করিবার মানসে একটি নূতন ক্ষত্রিয় শক্তি সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। এই কার্য্য যথার্থ ভাবে সুসম্পন্ন করিবার পথে প্রবল বাধা পাইতে হইবে জানিয়াও তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তাঁহার এই অভিনব চেষ্টায় অনেক শিখই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগের সে বিরক্তি উপেক্ষা করিয়া, নীচ কুল হইতে বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া লইয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নীচকুলোদ্ভূত শিখেরা এই সম্মাননায় তাঁহার প্রতি আরও প্রবল ভাবে অনুরক্ত হইয়া উঠে।

নব ক্ষাত্র-শক্তির উদ্বোধন-প্রয়াস

ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীরা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পূর্ব্বে ইষ্টদেবীর নিকট শক্তি যাচ্ঞা করিয়া থাকেন। গোবিন্দও সেইজন্য

স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বক্ষণে আরাধ্যা দেবী শক্তি-স্বরূপিনী ৺নয়না দেবীর আশীর্ব্বাদ একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়া অনুভব করিলেন। দেবীর আশীর্ব্বাদ পাইলে বিশ্বাসী মানবের কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকে? শক্তি-রূপিনী দেবীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া বঙ্গের বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাবীর শিবজী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দেবীপূজা

গোবিন্দও আজ চিরপ্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিয়া দেবীপূজায় মনঃ সংযোগ করিলেন। ৺কাশী হইতে বেদজ্ঞ পুরোহিত আনাইয়া বৎসর কাল ধরিয়া অনবরত দেবীর পূজা হইতে লাগিল। শুনা যায়, সেই আবেগপূর্ণ পূজায় প্রীত হইয়া দেবী গোবিন্দের তরবারিতে একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন ও তাঁহারই প্রসাদে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি ভেদ করিয়া একটি কুঠার উত্থিত হয়। দেবীর প্রীত্যর্থে ও শিখসম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য গুরু দেবীর শ্রীচরণে একটি মহাবলী উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভাবী স্বাধীনতা-যজ্ঞের সূচনা করিলেন। *

প্রতাপাদিত্য ও শিবজী

পূজার সমাপ্তি

দেবীর বরে অনুপ্রাণিত হইয়া গোবিন্দ শিখদিগকে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। অচিরে আনন্দপুরে এক মহোৎসব সংঘটিত হইল। গুরু-দর্শনের জন্য শিখগণ দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া তথায় সমবেত হইলে গোবিন্দ কৌশল-ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিনিচয়কে বাছিয়া লইতে উৎসুক হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমবেত শিখমণ্ডলীর মধ্যে

উৎসব

* বিক্রম সম্বৎ ১৭৫৫ অব্দে (১৬৯৮ খৃঃ) এই যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কৃপাণ হস্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'পাঁচ জন শিখের পবিত্র শির চাই। এস কে দিবে।' গুরুর প্রীতি সাধনের জন্য নিষ্কাম ভাবে মরিতে হইবে—এইরূপ ভাবে মরিতে কয় জন শিখ সম্মত? গুরুর সেই আহ্বানে হঠাৎ সকল কোলাহল নিবিয়া গেল—শিখসমাজ নীরবে সে আহ্বান শুনিতে লাগিল—কোন উত্তর নাই, চারিদিক গভীর নিস্তব্ধতায় ভরিয়া গেল। সে ঘোর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গুরু আবার ডাকিলেন 'কে দিবে?' ভীষণ প্রতিধ্বনি করিয়া পুনরায় তাহা বাতাসে মিশিয়া গেল; তথাপি কেহই নড়িল না। গুরু পুনরপি ডাকিলেন—'এস কে দিবে?' এইবার একপ্রান্তে মনুষ্যের চাঞ্চল্য দেখা দিল। সকলে স্তব্ধ হইয়া দেখিল, লাহোর-নিবাসী ক্ষত্রিয় দয়াসিংহ সেই বিরাট্ জনতা ভেদ করিয়া গুরুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং প্রথম দুই আহ্বানে উত্তর না দেওয়ায় অপরাধীর ন্যায় বিনয় সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সানন্দে গুরু তৎসহ শিবিরে গমন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ছাগ বলি দিলেন। গুরুর সামান্য প্রীতির জন্য দয়াসিংহের পবিত্র মস্তক দেহচ্যুত হইল ভাবিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল!

গুরুর প্রার্থনা

দয়াসিংহ

একবার কেহ প্রথমে পথ দেখাইলে, অনেকেই সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহস পায়, ইহাই মানব-রীতি। দয়াসিংহের পর আরও চারিজন যথাক্রমে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। গুরু তাঁহাদিগের প্রত্যেককে লইয়া যাইয়া প্রতিবারেই ছাগ বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চ বিশ্বাসীকে একত্রিত করিয়া যখন তিনি শিখ-মণ্ডলীর মধ্যে পুনরায় দেখা দিলেন,

চারিজন মহাপুরুষ

তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহাকে সেই দ্বাপরের পঞ্চ পাণ্ডবের সারথি বা নেতৃস্বরূপ বলিয়া সকলের বোধ হইল। সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এইরূপ কৌশলে সাধারণ শিষ্যগণ হইতে পাঁচজন শ্রেষ্ঠ শিষ্যকে পৃথক্ করা হইল।

খালসা

ইঁহারাই শেষে খালসা হইয়াছিলেন। এই পাঁচ জনের নাম যথাক্রমে—(১) লাহোরনিবাসী ক্ষত্রিয় দয়াসিংহ, (২) হস্তিনাপুরনিবাসী জাঠ ধর্ম্মসিংহ, (৩) দ্বারকানিবাসী জনৈক 'ছিপা' * মাহ্কমসিংহ, (৪) ব্রিদর্ভনগরনিবাসী জনৈক নাপিত সাহেব সিংহ, ও (৫) উড়িষ্যার অন্তঃপাতী ৺পুরী নিবাসী জনৈক কাহার হিম্মতসিংহ।

অতঃপর দীক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইল। † দীক্ষাকে শিখেরা 'পহল' বা

অমৃত উৎসব

অমৃত উৎসব বলে। গোবিন্দ স্বয়ং একটি লৌহপাত্র করিয়া নিকটস্থ নদী হইতে জল আনিলেন। এই সময় গুরুপত্নী পঞ্চপ্রকার মিষ্টান্ন লইয়া তথায় হঠাৎ আবির্ভূত হওয়ায় গুরু সে ঘটনা শুভজনক মনে করিয়া শিষ্যদের বলিলেন যে,শিখসম্প্রদায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ও শিখেরা মিষ্টভাষী হইবে। অতঃপর তিনি সেই সব মিষ্টান্ন জলে দিয়া দৈব-প্রভাব-যুক্ত তরবারিখানি দিয়া ঘুঁটিতে

* যাহারা কাপড়ে ছাপ দেয় বা বস্ত্র রঞ্জিত করে তাহাদিগকে ছিপা ও সংস্কৃতে রঞ্জক বলে।

† যেস্থানে এই দীক্ষা কার্য্য সাধিত হয়, সেস্থান কেশগড় নামে পরিচিত। ইহা আনন্দপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। এই দীক্ষার তারিখ সম্বন্ধে কিছু গোল দেখা যায়। কোন মতে ১৭৫৭ সংবতের (১৭০০ খৃঃ) বৈশাখী সংক্রান্তিতে, কোন মতে ১৭৫৬ সংবতের (১৬৯৯ খৃঃ) বৈশাখের প্রথম দিবসে এই পহল কার্য্য সম্পন্ন হয়। শেষোক্ত তারিখ ঠিক বলিয়া মনে হয়।

লাগিলেন। এইরূপে সরবত প্রস্তুত হইলে, তিনি তাহা লইয়া পাঁচবার মাথায় রাখিলেন ও পরে তাহা সেই নির্ব্বাচিত খালসাদের চক্ষে ছিটাইয়া দিলেন। খালসারা প্রত্যেকে অঞ্জলি পুরিয়া সরবত পান করিলেন ও পানান্তে উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন—“বাহি (ওয়াহ্) গুরুজীকী ফতে।” এইরূপে তাঁহারা দীক্ষিত হইলে গুরু স্বয়ং আবার তাহাদিগের নিকট দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষান্তে তিনি সকলের নাম পরিবর্ত্তন করিলেন। এতাবৎকাল শিখ-সমাজে ‘সিংহ’ উপাধি ছিল না, গোবিন্দ দীক্ষান্তে সকল শিখকে এই উপাধি প্রদান করিলেন; নিজেও ‘সিংহ’ উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল গোবিন্দ রায়, এখন নাম হইল—গোবিন্দ সিংহ।

নাম পরিবর্ত্তন

দীক্ষান্তে গোবিন্দ বলিলেন—

খালসা গুরুসে ওর গুরু খালসাসে হৈঁ।
যে (ইয়ে) এক দুসরা কা তাঁবেদার হৈঁ॥

—অর্থাৎ খালসা গুরু হইতে জাত এবং গুরুও খালসা হইতে জাত, তাঁহারা একে অপরের রক্ষাকর্ত্তা বা দাস। আরও বলিলেন যখনই পাঁচজন খালসা একত্রিত হইবে, তখন গুরুও সেখানে উপস্থিত থাকিবেন; অর্থাৎ পাঁচজন খালসাই একা গুরুর সমান মান্য। তারপর তিনি সমবেত শিখদের উপদেশ দিলেন—

শিখেরা পরস্পর হিংসা করিবে না বা কখন আত্মকলহ করিবে না। তাহারা এক অদৃশ্য অকাল-পুরুষ পরমেশ্বরের পূজা করিবে। নানক ও অন্যান্য গুরুদিগের নাম সসম্মানে স্মরণ রাখিবে। তাহাদের সঙ্কেত ধ্বনি হইবে—‘বাহিগুরু’। একমাত্র ‘গ্রন্থ’ ব্যতীত

অন্য কোন দৃশ্য পদার্থকে তাহারা পূজা করিবে না। গুরুগ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ করিবে ও তাহাকে গুরুর স্বরূপ জানিবে।

উপদেশ

দৃঢ়ব্রত, প্রিয়ভাষী ও সত্যবাদী হইবে। পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে। সর্ব্বদা বিনীত থাকিবে। 'জবাই-করা' মাংস আহার করিবে না। তামাক ও গঞ্জিকা সেবন এবং ম্লেচ্ছের প্রস্তুত খাদ্যের আহার নিষিদ্ধ হইল। পঞ্চ কক্কা * অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুণী), কচ্ছ (ছোট পায়জামা), ও কড়া (লোহার বালা) সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিবে। কাহাকেও অর্দ্ধ বা বিকৃত নামে ডাকিবে না। কখন মাথা খালি রাখিবে না—সর্ব্বদা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিবে, কখনও দ্যূত ক্রীড়া করিবে না। ধর্ম্ম, দেশরক্ষা ও দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য শিখেরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এই বিশ্বাসে সর্ব্বদা উজ্জীবিত থাকিবে। মন হইতে কাতরতা দূর করিবে। তুর্ককে বিশ্বাস করিবে না। বাহুবলের উপর যোদ্ধার আত্মধর্ম্ম নির্ভর করে। তরবারিই শিখের প্রধান সহায়। আপনাদের 'সিংহ'যুক্ত নাম রাখিবে। অস্ত্র ব্যবহারজ্ঞই সুপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবে; শিখেরা সর্ব্বদা যুদ্ধরত থাকিবে। যাহারা রণবাহিনীর সম্মুখভাগে গিয়া যুদ্ধ করিবে, যাহারা শত্রু বধ করিবে এবং পরাজিত হইলেও যাহারা নিরাশ হইবে না, তাহারাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইবে। যাহারা গুরুদের বিরুদ্ধাচারী ও যাহারা শিশু-হত্যা প্রথার দাস, অতঃপর গোবিন্দ তাহাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে শিখ-সমাজ হইতে চ্যুত করিলেন।

---

* শিখেরা 'ক' 'খ' উচ্চারণ না করিয়া 'কক্কা' 'খখ্ খা' বলেন। পঞ্চ কক্কা—আদ্যক্ষর 'ক' যুক্ত পাঁচটি দ্রব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঔরঙ্গজেব

প্রেমই এ জগতের সকল বিরোধের মহৌষধ। শক্তিমান্ যদি তাঁহার শারীর বলের উপর নির্ভর না করিয়া প্রেম দ্বারা দুর্ব্বলকে পোষণ করিতে প্রয়াস পান, তবে দুর্ব্বল সহজেই তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়ে; কিন্তু যদি তিনি বল-মুগ্ধ হইয়া দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করিতে অথবা তাহার সহিত অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হন, তবে সে দুর্ব্বল আপাততঃ কিছু করিতে সমর্থ না হইলেও, তাহার হৃদয় শোকে-ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং ক্রমে তাহা নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হইতে থাকে। এরূপ নৈরাশ্য-পীড়িত হইবার দ্বিবিধ পরিণাম দৃষ্ট হয়। যদি সে দুর্ব্বল একান্তই অদৃষ্টবাদী হয়, তবে তাহার সহিষ্ণুতার সীমা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; শোকই তাহার একমাত্র সহচর হইয়া উঠে; কিন্তু যদি অদৃষ্টবাদে তাহার প্রবল ভক্তি না থাকে, অথবা কোনক্রমে সে ভক্তি ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার হৃদয় দুর্জ্জয় ক্রোধে অভিভূত হইয়া উঠে ও সে সেই ক্রোধের বশে অথবা ক্রোধ-সঞ্জাত কুটিল কৌশলক্রমে শক্তিমানের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য দুঃসাহসিক হইয়া

প্রেম ও অত্যাচার

অত্যাচারের ফল

উঠে। তখন আর মৃত্যুভয়ে তাহার হৃদয় দমিত হয় না। অত্যাচারকে সে তখন সাহ্লাদে বরণ করিয়া লয়।

মোগলকুলতিলক আকবর এই সত্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাই প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল যাঁহারা সাময়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে মুগ্ধ হইতে চাহেন না—চিরন্তন কল্যাণই যাঁহাদের চরম লক্ষ্য, তাঁহারা অবশ্য তাঁহার সে সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হন নাই। কিন্তু দেশে তেমন নীতিবান্ সূক্ষ্মদর্শী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যা বড়ই বিরল। কাজেই সম্মোহন মন্ত্রই বিজাতীয় রাজন্যবর্গের প্রধানতম অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আকবর

সম্মোহন মন্ত্র

আকবর-প্রচারিত মন্ত্রের অভাবনীয় সাফল্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অধিক যত্নপর ছিলেন; কিন্তু মোগল-রাজলক্ষ্মীর দুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব এই সত্যটুকু ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কূট-কৌশল ও অমিত বাহুবলই রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ মনে করিয়া তিনি ভ্রমে পতিত হইলেন। সত্য বটে, তুর্কেরা অসির সাহায্যে ভারত জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্য জয় করা ও রাজ্য রক্ষা করা এক কথা নহে। দেশজয় শারীর বলের পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে হইলে বিজিত প্রজাবর্গের হৃদয় সর্ব্বাগ্রে জয় করা আবশ্যক। রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষ রাজগণের একটি পরীক্ষাক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইতে

ঔরঙ্গজেব

রাজ্যজয় ও রক্ষা

পারে। প্রজাগণ স্বতঃই শান্তিশীল ও প্রাক্তন-বাদী, সুতরাং রাজগণের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। ঈদৃশ প্রজাগণকে শাসন করা অতীব সহজ কার্য্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রজাশক্তিকে পদদলিত করিতে প্রয়াস পাওয়া রাজগণের নিতান্তই ধৃষ্টতাসূচক। প্রজাগণের শান্তিশীলতার প্রশ্রয় পাইয়া আপনার শারীর বলকে বড় করিয়া ভাবিতে যাইলেই রাজগণ সহজেই গর্ব্বমুগ্ধ হইয়া পড়েন ও নিরীহ প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রাজবংশের অশেষ অকল্যাণ সাধন করেন।

রাজা ও প্রজা

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবও প্রজার গুণে প্রশ্রয় পাইয়া মদমত্ত হইয়া উঠেন, এবং ধর্ম্মের নামে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন। সম্রাট্ ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধক হইলেও তাঁহার হৃদয় সন্ন্যাসীর ছিল না—তাহা সন্দেহে ও কূট-কৌশলে পূর্ণ ছিল। স্বীয় ঐশ্বর্য্যের উন্নতিই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। পরের উন্নতি—এমন কি অধীন ব্যক্তিদিগের কোনরূপ উন্নতিও তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কূট-কৌশলের আশ্রয় লইয়া তিনি অচিরাৎ বর্দ্ধমান ব্যক্তিদিগের বিনাশ সাধন করিতেন। এইরূপেই মারবারের যশোবন্ত, অম্বরের জয়সিংহ ও সেনাপতি মির জুমলার পতন সাধিত হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতা

আকবরের ন্যায় ঔরঙ্গজেবের দূরদর্শন-শক্তি ছিল না। থাকিলে, বোধ করি, ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপে বর্ণিত হইত। কিন্তু বুঝি তাহা বিধাতার ইচ্ছা নহে! ঔরঙ্গজেব মুসলমান প্রজাদিগকে তুষ্ট রাখিবার মানসে ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা সুচারুরূপে রাজ্য করিবার ভ্রমে পড়িয়া, হিন্দু প্রজাদিগকে

ভেদ নীতির বিষময় ফল

নানারূপে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশময় অসন্তোষ-বহ্নি ছড়াইয়া পড়িল। ফলে রাজপুতনার রাজসিংহ, দুর্গাদাস প্রভৃতি স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণ রাজপুত জাতিকে মোগলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন; সামান্য জায়গীরদার পুত্র শিবজী নিদ্রিত প্রজাশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া এক মহাবলশালী জাতিতে পরিণত করিয়া দাক্ষিণাত্যে নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন; শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের হৃদয়ে প্রতিহিংসাবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া নূতন শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

হীনবল গোবিন্দের এই প্রয়াস দুঃসাহসিক সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সংসারে কোন্ মহৎ কার্য্য বিনা দুঃসাহসিকতায় সাধিত হইতে পারে?

শিখগুরু

তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, দেশের স্থায়ী মঙ্গল বিধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশবাসীকে নিষ্ঠুর মোগলের প্রভাব হইতে মুক্ত করা বিশেষ আবশ্যক। এই বিশ্বাস বশেই তিনি ক্রমে স্বীয় হৃদয়নিহিত যন্ত্রণাকে সমগ্র দেশের যন্ত্রণার দারুণ প্রতিনিধি বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্যই শেষে তিনি স্বীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তিকে প্রসারিত করিয়া সমগ্র দেশের প্রতিহিংসা করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি তদীয় অনুচরগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন—'তুর্ককে বিশ্বাস করিও না। তাহা মারের ন্যায় নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হৃদয় চঞ্চল করিতে পারে—সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সর্ব্বদা তাহা হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে।' মানবের হৃদয়নিহিত নৈতিক শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি শিখদিগের প্রাণে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উন্মাদনার বলেই শিখেরা মধ্যযুগে প্রবল অত্যাচার সত্ত্বেও

স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

শিষ্যদিগের হৃদয় যথোচিত ভাবে গঠিত করিয়া গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন এবং এক এক জন প্রবল বিশ্বাসী ও কার্য্যনিপুণ ব্যক্তিকে সেই সব দলের অধিনায়ক বৃত করিয়া তাহাদিগের যুদ্ধস্পৃহা জাগরূক রাখিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সকলেই নূতন এবং পদাতিক। তাঁহার দলে অশ্বারোহী সৈন্যের বিশেষ অভাব ছিল; কিন্তু বেতনভোগী পঞ্চ শত পাঠান অশ্বারোহী নিযুক্ত করিয়া তিনি সে অভাব পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের পাদদেশে তিনি কয়েকটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। মুখওয়ালে তাঁহার একটি দুর্গ ছিল। এইটি তাঁহার পিতা তেগ বাহাদুরের কীর্ত্তি। বর্ত্তমান রোপড় তহশীলের অন্তর্গত চমকৌড়ে তিনি আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গটি ক্ষুদ্র হইলেও পর্ব্বতশীর্ষে অবস্থানহেতু দুর্ভেদ্য ছিল।

শিখ-সৈন্য

শিখ-দুর্গ

গোবিন্দ এই কয়টি দুর্গ প্রভাবে ও শিখসৈন্যগণের সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবৃন্দের উচ্ছৃঙ্খলা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কতকগুলি অর্দ্ধস্বাধীন রাজাদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। ফলতঃ তিনি রাজন্যবৃন্দের উপর কখন প্রেম কখন বা অস্ত্রের প্রভাবে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিতে বিধিমত প্রয়াস পাইতেছিলেন।

শিখগুরু ও পার্ব্বত্য রাজন্য

নবম পরিচ্ছেদ

হৃদয়ের পরিচয়

মহারাজ শিবজী যে নীতি অবলম্বন করিয়া প্রবল মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই শেষে তাহার ধ্বংসের অন্যতম কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়াও উদীয়মান মারাঠীর হৃদয় হইতে অর্থস্পৃহা নষ্ট করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর অর্দ্ধ শতাব্দী কাল অতীত হইতে না হইতে তাহারা দস্যুতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 'দস্যুবর্গী' নামে পরিচিত হইয়া সকলের ঘৃণার ও ভীতির পাত্র হইয়া উঠে। এইরূপে তাহারা দেশের প্রজাবৃন্দের হৃদয়জাত সহানুভূতি হারাইয়া ফেলে।

দস্যুবর্গী

গোবিন্দ সিংহ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, অর্থস্পৃহা বড়ই ভয়ানক। তাহাই সকল পাপের জনয়িতা। ক্রমে তাহা প্রবল হইয়া মানবের সকল মহদ্‌গুণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। অর্থস্পৃহা হইতে মানব-মনকে সর্ব্বদা দূরে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে শক্তি একটি মহৎ কার্য্য সাধনে উদ্‌যুক্ত হইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পবিত্র ও নিস্পৃহ না থাকিলে, অচিরেই

অর্থস্পৃহা

তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। এই ভাবিয়া গোবিন্দ বারম্বার অর্থের নিন্দা ও নিস্পৃহতার গুণ গান করিয়াছেন। অর্জ্জিত অর্থ সঞ্চিত না রাখিয়া দরিদ্রদিগকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য, গুরু-সেবায় নিয়োগ করিবার জন্য, অথবা অতিথি ও পথিকদিগের সৎকারে ব্যয় করিবার জন্য, তিনি শিখদিগকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরুভক্ত শিখেরা তাহা অবিবাদে মান্য করিয়া লয় ও বিশেষ যত্নের সহিত গুরুবাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য প্রয়াস পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল রাজন্যবৃন্দের প্রবল তাড়নায় আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় লইলে, উদরপূর্ত্তির জন্য অবশ্য কিছুকাল তাহাদিগকে দস্যুতা করিতে হইয়াছিল; কিন্তু সে দস্যুতা তাহাদিগের জাতিগত হইয়া উঠে নাই, প্রত্যুত সে সময়েও তাহারা অতিরিক্ত ধন দেব-সেবায় ব্যয় করিত।

তন্নিবারণের উপায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিখ

গোবিন্দ কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শিষ্যদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং স্বীয় উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন। বিলাসের দ্রব্য তিনি স্পর্শ করিতেন না। যদি কোন শিখ ভ্রমক্রমে তাঁহাকে কোন বিলাস দ্রব্য প্রদান করিত, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতেন না; কিন্তু অচিরেই তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। ইহাতে শিষ্যের মনে তেমন ক্ষোভেরও উদয় হইতে পাইত না, বরং সে আপনার ভ্রম স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইত।

শিখগুরুর আত্মসংযম

একদা একটি শিখ সিন্ধুদেশ হইতে এক জোড়া সুন্দর বলয় আনিয়া শ্রীগুরুকে উপহার দেয় এবং গুরু যাহাতে তাহা ব্যবহার

করেন, এজন্য তাঁহাকে অতীব বিনীত ভাবে ও সাগ্রহে নিবেদন করে। বলয়-যুগলের মূল্য পঞ্চাশৎ সহস্র মুদ্রা। গুরু শিষ্যের প্রীতির জন্য সস্মিত বদনে তাহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিলে গুরু-অঙ্গে ভূষণ দেখিয়া শিষ্যের পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন গুরু নদীতে গমন করিয়া হাসিতে হাসিতে একটি বলয় জলে নিক্ষেপ করিলেন। ফিরিয়া আসিলে, শিখ সে বলয়ের অদর্শনের কারণ জানিতে উৎসুক হওয়ায় গুরু বলেন যে, তাহা জলে পতিত হইয়াছে। তখন তাহা উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া শিষ্যবর বহু অর্থ প্রলোভনে একটি সুদক্ষ ডুবারি সংগ্রহ করিল। ডুবারি বলিল—কোথায় পড়িয়াছে দেখাইয়া দিলে, সে তাহা উদ্ধার করিতে পারে। তখন শিখ স্থান প্রদর্শন করিবার জন্য গুরুকে বারম্বার নিবেদন করিলে, গুরু অপর বলয়টি জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'ঐস্থানে পড়িয়াছে।' গুরুর এই আচরণে শিখ আশ্চর্য্য হইয়া গেল ও গুরুর মনোগত ভাব উপলব্ধি করিয়া বলয় উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিল।

বহুমূল্য বলয় ত্যাগ

আর একবার একটি শিখ দাক্ষিণাত্য হইতে একখানি তরবারি,একটি হস্তী, কয়েকটি শ্বেত শিকারী পক্ষী, স্বর্ণের কাজকরা একটি সুদৃশ্য তাঁবু ও একটি আরবীয় অশ্ব আনয়ন করিয়া গুরুর চরণে উপহার প্রদান করে। এই বহুমূল্য উপহারের কথা অচিরেই চারিদিকে বিঘোষিত হইয়া পড়ে। গোবিন্দের পার্ব্বত্য বান্ধব রাজন্যবৃন্দ এই উপহার দেখিবার জন্য স্ব স্ব রাজ্য ত্যাগ করিয়া আনন্দপুরে * আগমন করেন। গোবিন্দ

বহুমূল্য উপহার

* আনন্দপুর, মুখওয়ালের পার্শ্ববর্ত্তী নগর অথবা মুখওয়ালের অংশ বিশেষ

বিশেষ সমাদরে অতিথিবৃন্দের অভ্যর্থনা করিলেন। সর্ব্বসাধারণকে প্রদর্শন করিবার জন্য অচিরেই এক দরবার অনুষ্ঠিত হইল। সেই বহুমূল্য শিল্পচাতুর্য্য-পরিচায়ক তাঁবুটি খাটান হইল, পশুগুলিকে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইল।

রাজন্যবর্গের অন্যায় লোভ

এই সকল দ্রব্য দেখিয়া রাজন্যবর্গ অতিশয় লোভ পরবশ হইয়া কোন ক্রমে সেগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। হস্তী ও তাঁবুর উপর কহ্‌লুরপতি ভীমচাঁদের এবং অশ্ব, তরবারি ও পক্ষীর উপর হিণ্ডুর-রাজ হরিচাঁদের লোভ পড়িল। লোভাতিশয্য দমন করিতে না পারিয়া হরিচাঁদ সাগ্রহে তরবারিখানি স্বীয় কোষযুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে আর গোবিন্দের বাকি রহিল না। তখন তিনি স্মিত-মুখে বলিলেন—'শিষ্য আমার এগুলি দূরদেশ হইতে আনিয়াছে। যাহাতে আমি এগুলি ব্যবহার করি, এজন্য সে কত অনুরোধ করিয়াছে। তাহার প্রীতির জন্য আমাকে এগুলি একবার ব্যবহার করিতে দিন। অন্ততঃ একবার আমি এগুলি ব্যবহার করিয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে তাহার বড়ই প্রীতি জন্মিবে। তৎপরে আপনাদের অভিলাষ হয়, আপনারা এগুলি অনায়াসে লইতে পারিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকে একবার এগুলি ব্যবহার করিতেই হইবে।'

গোবিন্দ একথা বলিলেও তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাব রাজগণের নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে না, এজন্য হয়ত

বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আনন্দপুর স্থাপিত হইবার পর হইতে শহরটি দুই নামেই পরিচিত হইতে থাকে।

তাঁহারা রক্তপাত করিয়াও দ্রব্যগুলি অধিকার করিতে প্রয়াস পাইবেন। তাই যাহাতে সেরূপ কোন বিপদ না ঘটে, এজন্য তিনি তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য বিধিমত প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—'লোভাৎ ক্রোধঃ, ক্রোধাৎ সঞ্জায়তে মোহঃ।' আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা জন্মিলে, দুর্ব্বল-হৃদয় সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং ক্রোধবশে অকাণ্ড সাধনেও পশ্চাৎপদ হয় না। লোভপরবশ রাজগণও গোবিন্দের বাক্য শুনিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, নানা ছন্দে তাঁহাকে তিরস্কার ও কটূক্তি করিতে থাকিলেন, কেবল তাহাই নহে। গোবিন্দের ও শিখ-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য তাঁহারা নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা ছল ধরিলেন—ঐরূপ চুক্তির কথা প্রস্তাব করায় তাঁহাদের অপমান করা হইয়াছে! গোবিন্দের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা গোবিন্দের দাস নহেন!

শিখগুরুকে ভয়প্রদর্শন

রাজগণের এই প্রকার নানা কটূক্তি শুনিতে শুনিতে শিখেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়াও শেষে আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না। সশস্ত্র হইয়া তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'বাহি (ওয়াহ্) গুরুজী কী ফতে (ফতেহ্)!' সে চীৎকার শুনিয়া রাজগণের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তখন তাঁহাদের স্মরণ হইল, তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে গোবিন্দের অধিকারভুক্ত। সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য না আনায় তাঁহাদের হৃদয় আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইল। গোবিন্দ তাঁহাদের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন।

শিখদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি

অঙ্গুলিসঙ্কেতে উন্মত্ত শিখগণকে শান্ত করিয়া, গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ রাজগণকে তথা হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন। পরদিন তাঁহারা অপমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

গুরুর প্রতি অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া শিখেরা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠে ও রাজগণকে নানা কটূক্তি করে।

শিখগুরুর উদারতা

অতিথিবৎসল গোবিন্দ শিখদিগের এ ব্যবহারে প্রীত হইলেন না। হিন্দুসংসারে অতিথি সর্ব্বপূজ্য। সেই অতিথি ভ্রমক্রমে বা লোভ বশতঃ কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, সদুপদেশ ও সদ্ব্যবহারে তাঁহাকে নিরস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিলে পাপ স্পর্শে। তাই গোবিন্দ শিখদিগকে তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন, আমার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তোমাদের প্রবল আগ্রহ প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজগণের প্রতি তোমরা যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছ, তাহা নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে, এবং তাহা আমার মতের ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। আমি বারম্বার বলিয়াছি—শিখেরা মিষ্টভাষী হইবে। সুতরাং ভবিষ্যতে আর তোমরা এরূপ অন্যায় করিতে পারিবে না।' লজ্জায় শিখেরা অধোবদন হইয়া রহিল।
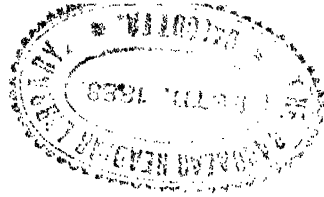
দশম পরিচ্ছেদ

ভিঙ্গালীর যুদ্ধ

স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কহ্‌লুরপতি ভীমচাঁদ শিখশক্তি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শক্তিসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের ঋদ্ধিকাতর কতিপয় পার্ব্বত্য রাজন্যও তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। গোবিন্দও যথাসময়ে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের অধিকাংশই নূতন, এজন্য তিনি অপর কোন একটি শক্তির সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সময় নাহনের অধিপতি মেদিনী প্রকাশের সহিত হিণ্ডুর-রাজ হরিচাঁদের মনান্তর চলিতেছিল। যুদ্ধের আশু সম্ভাবনা থাকায় মেদিনী প্রকাশ গুরুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গুরু দেখিলেন, হিণ্ডুর-রাজ তাঁহারও শত্রু বটে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মেদিনী প্রকাশের সহিত যোগ দিলেন ও রাজধানী আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া নাহনের অন্তর্গত পাবটা (পাওটা) নামক একটি গ্রাম আবাদ করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নাহনপতির সহিত মিলন

এই সময় গোবিন্দ-বন্ধু শ্রীনগর-রাজ ফতহ্‌ সাহের * কন্যার

* ইনি কোথাও ফতহ্‌ সাহ, কোথাও বা ফতহ্‌ চাঁদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

সহিত ভীমচাঁদের পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ কিছুকাল স্থগিত থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে কুটিলপ্রকৃতি ভীমচাঁদ গোবিন্দের নিকট একটি দূত পাঠাইয়া হস্তীটি পুনরায় যাচ্ঞা করেন। এবার গোবিন্দকে যথেষ্ট প্রলোভনও দেখান হইয়াছিল; কিন্তু শিখগুরু সহজে মুগ্ধ হইবার পাত্র নহেন। তিনি পার্ব্বত্য রাজের দুরভিসন্ধি সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, দূতকে দূর করিয়া দেন। ভীমচাঁদ এই অপমানে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া উঠেন; কিন্তু শুভকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে ভাবিয়া সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না।

ভীমচাঁদের কৌশল

কহ্লুর * হইতে শ্রীনগরে † যাইবার দুইটি পথ ছিল। যে পথ দিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই শ্রীনগরে পৌছান যায়, তাহারই পথিমধ্যে পাবটা অবস্থিত। ভীমচাঁদ গোবিন্দকে যতই হিংসা করুন না, শিখগুরুর স্বাভাবিক ঔদার্য্যের প্রতি তাঁহার অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে পুত্রকে সেই পথে পাঠাইয়া স্বয়ং ভিন্ন পথে শ্রীনগরে গমন করেন। রাজকুমার পাবটার নিকট উপস্থিত হইলে, গুরু হাসিয়া বলিলেন— 'কুমার! এখন যদি আমি তোমায় বন্দী করি, তাহা হইলে তোমার পিতা কি করিবেন?' এ কথা গুরু বলিলেন বটে, কিন্তু পথ ছাড়িয়া দিলেন। অধিকন্তু স্বীয় দেওয়ান নন্দচাঁদের সহিত বিবাহের উপঢৌকনস্বরূপ লক্ষাধিক মুদ্রার দ্রব্য শ্রীনগরে প্রেরণ

গোবিন্দের ঔদার্য্য

* পঞ্জাবের উত্তর প্রদেশস্থ বিলাসপুরই প্রাচীন কহ্লুর রাজ্য।

† শ্রীনগর দেরাদুন হইতে বহু পূর্ব্বে এবং হরিদ্বারেরও বহু পূর্ব্বোত্তরে অলকনন্দার তীরে অবস্থিত। নগরের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৭৩৪ ফিট।

করিলেন। যথাকালে বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু ভীমচাঁদ তখন পর্য্যন্ত গোবিন্দ-প্রেরিত উপঢৌকনের কথা জানিতে পারেন নাই। যখন সে কথা তিনি শুনিতে পাইলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—'দেখিতেছি, ফতহ্‌সাহের সহিত গোবিন্দের বিশেষ সম্প্রীতি বর্ত্তমান! এরূপ অবস্থায় ফতহ্‌সাহের সহতি আমি কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহি না।' এই কথা শুনিয়া ফতহ্‌সাহ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। শেষে ভীমচাঁদের ক্রোধশান্তির জন্য গোবিন্দের সহিত বন্ধুত্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈবাহিকের পক্ষ সমর্থন করিতে তিনি বাধ্য হইলেন।

ভিঙ্গালীর যুদ্ধ

শুভকার্য্য শেষ হইতে না হইতেই ভীমচাঁদ—কঠৌজপতি কৃপালচন্দ্র, জস্‌সোবালের অধিপতি কেশরীচন্দ্র, জসরূঠের রাজা সুখদয়াল, হিণ্ডুরপতির হরিচাদ, ডডালরাজ পৃথ্বিচন্দ্র ও বৈবাহিক শ্রীনগররাজকে লইয়া বীর বিক্রমে গোবিন্দের প্রতি ধাবমান হইলেন। গোবিন্দও সেই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, দ্বিসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৪২ বিক্রম সম্বতের ১৭ই বৈশাখ (১৬৮৫ খৃঃ)

প্রথম দিন

যমুনা ও গরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভিঙ্গালী ক্ষেত্রে * উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়েই উভয়কে অস্ত্রাদি ক্ষেপণ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন; ক্রমে যুদ্ধ বেশ জমিয়া গেল। উভয় দলের সৈন্যদিগের মুহুর্মুহুঃ উৎসাহ ধ্বনিতে রণক্ষেত্র মুখরিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াও কেহ কাহাকেও

* ভিঙ্গালী 'পাবটা' হইতে চারিক্রোশ দূরে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে ভ্রমক্রমে ভাঙ্গানীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হঠাইতে পারিল না। সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে ক্লান্ত দেহে সকলেই শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেইদিন মধ্যরাত্রে গোবিন্দের অধীন পঞ্চশত নাগাবীর যুদ্ধের ভীষণত্ব উপলব্ধি করিয়া গুপ্তভাবে গুরুর শিবির হইতে পলায়ন করে; কিন্তু কৃপাল দাস নামক জনৈক নাগা মোহান্ত কোনক্রমেই এইরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শনে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি স্বীয় পঞ্চজন অনুচর সহ গুরুর সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চশত নাগাবীর

তৎপর দিবস প্রাতঃকালে গোবিন্দের শিবিরে আবার আর একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। শিখগুরুর অধীনে পাঁচজন পাঠান আমীর কার্য্য করিত। শিখসৈন্য মধ্যে তাহারাই তখন একমাত্র অশ্বারোহী সেনা। এই আমীরেরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী মাত্র ছিল। তুর্ক রাজত্বের প্রারম্ভকাল হইতেই মধ্য এসিয়া হইতে এরূপ অনেক আমীর মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া যুদ্ধ ব্যবসায় চালাইতে থাকে। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে কিছু না কিছু সৈন্য থাকিত। সেই সৈন্যদিগকে লইয়া তাহারা কখন এ দলে, কখন সে দলে যাইয়া আপনাদিগের স্বার্থসাধন করিত। গোবিন্দের অধীনস্থ আমীর পঞ্চ পূর্ব্বে মোগল সরকারের অধীনে কার্য্য করিত; শেষে কোন কারণে সম্রাটের বিষনয়নে পতিত হওয়ায় তাহাদিগের সে কার্য্য নষ্ট হয়। উপরন্তু রাজসরকার হইতে এইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যে, কোন রাজাই তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। নিরুপায় হইয়া তাহারা গোবিন্দের শরণাপন্ন হইলে, গোবিন্দ বুদ্ধুশাহ ফকীরের অনুরোধে তাহাদিগকে দৈনিক এক টাকা

পাঠান আমীর

বেতনে নিযুক্ত করিয়া অনাহারে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। কৃতঘ্ন পাঠানেরা কিন্তু সে কথা অধিক দিন স্মরণ রাখিতে পারিল না। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সকল উপকার বিস্মৃত হইয়া বিপক্ষ দলের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টিত হইল। গোবিন্দকে এরূপ ভাবে হঠাৎ পরিত্যাগ করিলে গোবিন্দ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, ফলে তাহাতে বিপক্ষ পক্ষের যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় বিপক্ষ পক্ষ হইতে পুরস্কার এবং দুর্গ লুণ্ঠিত হইলে তাহার ভাগও পাইবে, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া তাহারা গুরুকে ত্যাগ করিল। তাহাদিগের এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু যাহারা কেবল অর্থের জন্য যুদ্ধব্যবসায় করে, সেই অর্থ-পিশাচদিগের নিকট এতদপেক্ষা আর কি ব্যবহার আশা করা যাইতে পারে! তাহারা বিদায় চাহিলে, গোবিন্দ বলিলেন—'অসময়ে তোমাদের সাহায্য করিয়াছি, বারবার তোমরা আমার নিকট সদয় ব্যবহার পাইয়াছ। ইহাই কি তাহার পুরস্কার! যখন তোমাদিগকে আমার যথার্থ প্রয়োজন, ঠিক্ তখনই তোমরা চলিলে!'

সৈন্যদিগের নিরুৎসাহ দমন

মুগ্ধ পাঠানেরা দুর্গত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে, অন্যান্য সৈন্যগণ কতকটা ভীত হইয়া পড়িল। পার্ব্বত্য রাজগণের অশ্বারোহী সৈন্যদিগের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা ত তাহাদের নাই! গোবিন্দ নানারূপ উপদেশে সৈন্যদের লুপ্ত সাহস জাগাইয়া অকস্মাৎ সসৈন্যে সেই বিশ্বাসঘাতক আমীরদিগের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিলেন। বহু পাঠানই রণশয্যায় চির নিদ্রাভিভূত হইল, অপর সকলে পলাইয়া শত্রু-শিবিরে আশ্রয় লইল।

এই ঘটনায় বিপক্ষ দলের শিবিরে এক মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। অনিবার্য্য জয়ের ভাবনায় তাহারা প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় দিন

জয়নাদ করিতে করিতে তখন তাহারা গোবিন্দের সৈন্য-দিগকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে গুরু-পক্ষ প্রথমে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু ফকীর বুদ্ধু শাহ আমীরদিগের ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক গুরু-পক্ষকে সবল করিয়া তুলিলেন। সেই ঘোর সংগ্রাম মধ্যে গোবিন্দের জীবন কয়েকবার অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। হিণ্ডুর-পতি হরিচাঁদের অব্যর্থ শরাঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। গোবিন্দও সামান্য ধানুকী ছিলেন না। তিনিও হরিচাঁদের প্রতি অজস্র বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া বীর রণশয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তখন গোবিন্দ অধিকতর বিক্রমের সহিত কেশরীচন্দ্র ও সুখদেবচন্দ্রের সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সে আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইলেন। গুরুর আঘাতে তাঁহারা উভয়েই বিষমভাবে আহত হইয়াছিলেন। এদিকে গোবিন্দপক্ষের লালচন্দ্র, নন্দলাল, মোহান্ত কৃপালদাস, সাহিবচন্দ্র, কৃপালুচন্দ্র, দেওয়ান নন্দচাঁদ, মাহরীচন্দ্র, ভাই সেগু, ভাই জয়তমল্ল, গুলাব রায়, গঙ্গারাম, দয়ারাম, জীবন সিংহ প্রভৃতি শিখ-সেনাপতিবৃন্দের আক্রমণে শত্রুপক্ষের প্রধান বীরবৃন্দের অধিকাংশই ধরাশায়ী হইলে, ফতহ্ শাহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দ্রুত পলাইয়া যান। তখন ভীমচাঁদ শত চেষ্টা করিয়াও পার্ব্বত্য সৈন্যদিগকে স্থির রাখিতে

পারিলেন না। অচিরেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ; প্রাণভয়ে যে যেখানে পারিল, পলাইয়া গেল। শেষে ভগ্নমনে ভীমচাঁদকেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইল। শিখসৈন্য কয়েক ক্রোশ পথ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া আসিল।

শত্রুপক্ষের পরাজয়

ভাই সংঘা, ভাই জয়তমল্ল ও বুদ্ধু শাহের জনৈক পুত্র প্রভৃতি কতিপয় বিশ্বাসী বন্ধুকে চিরবিদায় দিয়া গোবিন্দ এই ভীষণ যুদ্ধে বিজয়মাল্য ধারণ করিলেন। এই যুদ্ধজয়ই তাঁহার উল্লেখযোগ্য প্রথম যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধেই তিনি পিতামহের ন্যায় জয়ী হইয়াছিলেন।

শিখগুরুর রণজয়

বিজয়-দুন্দুভি নিনাদ করিতে করিতে গোবিন্দ সগৌরবে নূতন আবাস পাঁবটা দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের উৎসাহ ও শ্লাঘা বৃদ্ধি করিলেন। এই সময় গুরু ফকীর-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধু শাহের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে একটি পশমী 'আধী পগড়ী' ও একখানি 'হুকুমনামা' (গুরুর হস্তাক্ষরযুক্ত পত্র) প্রদান করেন। সেই হুকুমনামা অদ্যাপি বুদ্ধু শাহের বংশধর-দিগের নিকট অতীব সম্মানের সহিত রক্ষিত হইতেছে। মোহান্ত কৃপালুদাস তাঁহার মানসিক তেজস্বিতার পুরস্কারস্বরূপ গুরুর নিকট একটি 'আধী পগড়ী' প্রাপ্ত হন। এই পাগড়ী আজ পর্য্যন্ত 'হেহর' নামক স্থানে বিদ্যমান আছে।

পুরস্কার বিতরণ

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাজ্যবিস্তার

যুদ্ধ-জয়ের পর আরও প্রায় এক বর্ষকাল পাবটায় অবস্থান করিয়া গোবিন্দ মাতার আজ্ঞাক্রমে ১৭৪৩ বিক্রম সম্বতের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৬ খৃঃ) সপরিবারে আনন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গুরু স্বগৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া শিখেরা নানাবিধ অস্ত্রাদি উপহার সহ দলে দলে গুরুদর্শনে আসিতে লাগিল। গোবিন্দও তাহাদিগের যথাবিধ সম্বর্দ্ধনা করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের চিত্ত সমুন্নত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার স্নেহে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, একবার গুরুদর্শন করিতে আসিয়া সহজে বড় শীঘ্র কেহ গৃহে ফিরিতে চাহিত না। গোবিন্দও তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নানাপ্রকার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বহুশিষ্য একাদিক্রমে দুই, চারি বা ছয় মাস কাল গুরুসমীপে অবস্থান করিয়া সুদক্ষ সৈনিক হইয়া উঠিত। ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দের অশ্বারোহী সৈন্যের যে অভাব ছিল, এই সুযোগে তিনি তাহার পূরণ করিয়া লইলেন।

আনন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তন

শিখদিগের যুদ্ধশিক্ষা

শিষ্যদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াই গোবিন্দ নিশ্চিন্ত ছিলেন না; একটি বিশাল স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের অভিলাষ তাঁহার অতি-পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এক্ষণে তিনি নানাস্থানে কতক-গুলি নূতন ও সুদৃঢ় দুর্গনির্ম্মাণ করিলেন। তন্মধ্যে লোহগড়, আনন্দগড়, হোলগড়, ফতহ্‌গড়, সোগড় ও মুঘলগড়ই প্রধান। এই সকল দুর্গ প্রভাবে তাঁহার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, উত্তর পঞ্জাবে মোগলের প্রভাব অধিক, না, তাঁহার প্রভাব অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার শাসনগুণে উত্তর পঞ্জাব হইতে চোর, দস্যু, লুণ্ঠক প্রভৃতির অত্যাচার একেবারে লোপ পায়। তাহাদিগের কেহ বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক সাধারণ প্রজাবৃন্দের মত বসবাস করিতে বাধ্য হয় এবং কেহ বা দূরতর প্রদেশে পলাইয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে।

দুর্গনির্ম্মাণ

উত্তর পঞ্জাবে শিখ-প্রভাব

গোবিন্দের প্রতাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ভীতমনে পার্ব্বত্য রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত সকল শত্রুতা দূর করিয়া শিখশক্তি সহ সম্মিলিত হইলেন। গোবিন্দের ইচ্ছা ছিল, হিন্দু-রাজন্যবর্গকে এক করিয়া এমন একটি শক্তি সংগঠন করিবেন, যদ্দ্বারা মোগল শক্তির নাশ অতীব সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। এক্ষণে তিনি পার্ব্বত্য রাজন্যদিগের সহিত মিলন সফল করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে মোগলবিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে মোগল রাজত্ব আক্রমণ পূর্ব্বক হঠকারিতায় পরিচয় না দিয়া তিনি ধীরে ধীরে কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তদীয় নিদেশক্রমে সকলেই মোগলসরকারে কর-প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাজসংহতি

রাজদ্রোহ

এই সময় ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অবস্থান পূর্ব্বক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ব্যাপারে মত্ত ছিলেন। এই দুই রাজত্ব লোপ করিবার জন্য হিন্দুস্থানের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ সৈনিকই তথায় সমবেত হইয়াছিল। কাজেই পঞ্জাবের এই বিদ্রোহ-ব্যাপারে মনোযোগ দিবার অবকাশ তখন মোগল-সম্রাটের আদৌ ছিল না। ফলে এই রাজসংহতির ক্ষমতা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

সম্রাটের ঔদাসিন্য

গোলকুণ্ডা জয়ের পর কিছু অবসর পাইয়াই সম্রাট্ এই রাজসংহতির শক্তি নষ্ট করিবার জন্য সর্দ্দার মিয়াঁ খাঁ, অল্‌ফ খাঁ ও জবালকার খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির সহিত আপনারও কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগল সৈন্য মহা সমারোহে পঞ্জাবে উপস্থিত হইলে, পার্ব্বত্য রাজগণ প্রথমে কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন; কিন্তু গোবিন্দের উত্তেজনায় তাঁহাদিগের সে ভয় অচিরেই দূরীভূত হয়। মিয়াঁ খাঁ জম্বু অভিমুখে ধাবমান হন এবং অল্‌ফ খাঁ সসৈন্যে নাহন, কহলুর, নালাগড় ও চম্বা প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া কঠৌজপতি কৃপালচন্দ্র ও বিজড়বালের অধিপতি দয়ালুচন্দ্র রাজসংহতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলপক্ষে যোগদান করেন। নাদৌনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পার্ব্বত্য রাজন্যবৃন্দের সহিত মোগল সেনাপতির সাক্ষাৎ হয়। * ফলে যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে রাজপক্ষ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে;

বিদ্রোহ দমনের উদ্‌যোগ

নাদৌনের যুদ্ধ

* ১৭৪৪ বিক্রম সম্বতে ফাল্গুন মাসে (১৬৮৮ খৃঃ) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

কিন্তু যথাসময়ে শিখগুরুর নিকট হইতে পঞ্চশত অশ্বারোহী সহ শিখ সেনাপতি দেওয়ান নন্দচাঁদ, দেওয়ান মোহরীচাঁদ ও কৃপালুচাঁদ প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় মোগলেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া পলাইয়া যায়। শিখেরা বহুদূর পর্য্যন্ত মোগলদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু মোগলেরা শীঘ্রই বলসঞ্চয় করিয়া রাজাদিগকে পুনরাক্রমণ করে। এবারও কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত হইয়া লাহোরে পলাইয়া যাইতে হয়। এই যুদ্ধে গোবিন্দ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া রাজাদিগকে বরাবর সাহায্য করিয়াছিলেন।

মোগলদিগের পুনঃ পরাজয়

মোগলেরা সহজে প্রতিনিবৃত্ত হইবার লোক ছিল না। লাহোরের সুবাদার দিলবারখাঁ স্বীয় পুত্র রুস্তম খাঁকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া শিখগুরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন; কিন্তু রুস্তম বিশেষ চেষ্টা করিয়াও গুরুর কোন অনিষ্টই করিতে সমর্থ হইলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রের পাদদেশ ধৌত করিয়া 'হিমাবতী নালা' নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইত। যুদ্ধকালে এক ঘোর রজনীতে হঠাৎ পর্ব্বতে এত অধিক বৃষ্টিপাত হয় যে, তাহাতে ক্ষুদ্রবক্ষা নদী উচ্ছ্বলিত হইয়া দুকূল প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই সময় মোগলদগের শিবির নদীর অতি সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল। কাজেই নদীর প্রখর স্রোতে তাহাদিগের সমস্ত রসদাদি ও অস্ত্রশস্ত্র ভাসাইয়া লইয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে বহু সৈনিকও চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে বাধ্য হয়।

রুস্তমখাঁর আক্রমণ

মোগলদিগের দুর্ঘটনা

মোগল-দিগের পরাজয়

যথাকালে এই সংবাদ লাহোরে উপস্থিত হইলে দিলবার পুত্রের দুর্দ্দশায় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ সৈন্যের পর সৈন্য প্রেরণ করিতে থাকেন; কিন্তু এত চেষ্টাতেও কোন ফল দর্শিল না। পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া রুস্তম পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হন।

শাহজাদা মুয়াজম

এত চেষ্টা সত্ত্বেও মোগলেরা শিখদিগকে বশীভূত করিতে পারিল না দেখিয়া ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠেন। স্বীয় পুত্র শাহজাদা মুয়াজমকে সৈনাপত্যে বরণ করিয়া সম্রাট্ গুরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুয়াজম স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া স্বীয় অধীনস্থ সেনাপতি মিরজাবেগ দশহাজারীকে পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রেরণ পূর্ব্বক লাহোরাভিমুখে চলিয়া যান।

মিরজা-বেগের আক্রমণ

মিরজাবেগ প্রথম প্রথম শিখদিগকে পরাজিত করিয়া অতিমাত্র বিচলিত করিয়া তুলেন। যুদ্ধজয়ে তৃপ্ত না হইয়া তিনি নগর, গ্রাম লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার অত্যাচারে প্রজাবর্গের অবস্থা ক্রমশই হীন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া গোবিন্দের কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি একদা গভীর রজনীতে হঠাৎ মোগল শিবির আক্রমণ করিয়া শত্রুদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলিলে,

মোগল-দিগের পলায়ন

তাহারা স্ব স্ব প্রাণ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের সমস্তই ফেলিয়া পলাইয়া যায়। প্রায় আট ক্রোশ পথ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গোবিন্দ তাহাদিগের প্রাণে এমনই ভীতিসঞ্চার করিয়াছিলেন যে, তাহারা

আর অতঃপর কিছুকাল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই।

এইরূপে বর্ষ কয়েকের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় গোবিন্দ পঞ্জাবের পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্পষ্ট বলা যাইতে পারে, এই সময় তাঁহার রাজ্য দক্ষিণে শতদ্রুর বাম তীরস্থিত রোপড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। * পার্ব্বত্য রাজন্যগণ কার্য্যতঃ তাঁহার সামন্ত নৃপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গোবিন্দের রাজ্য-সীমা

গোবিন্দের এবম্বিধ শ্রীবৃদ্ধি সন্দর্শনে পার্ব্বত্য রাজন্যবর্গ সকলেই অত্যন্ত মনঃক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সাহস কিম্বা ক্ষমতা তাঁহাদিগের তখন ছিল না। এই সময় কহ্‌লুর-সিংহাসনে অজমেরচন্দ্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোবিন্দের প্রতাপ তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। গুপ্তভাবে তিনি পার্ব্বত্য রাজাদিগকে এক করিয়া গোবিন্দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিয়া রাজগণ হঠাৎ একদা আনন্দপুর অবরোধ করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু গোবিন্দের প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শীঘ্রই তাঁহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল।

পার্ব্বত্য রাজগণের শিখগুরু-দ্রোহ

* পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে গোবিন্দের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা সঠিক জানা যায় না। এ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ এখনও আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সামান্য সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎপ্রমাণে মনে হয়—উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে শতদ্রু নদী বা অম্বালা জিলা, পূর্ব্বে গড়বাল ও পশ্চিমে অমৃতসর বিভাগ পরিবেষ্টিত বিস্তৃত ভূখণ্ডই গোবিন্দের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

পরাজয়-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অজমেরচন্দ্র সিরহিন্দপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিসহস্র সৈন্য প্রার্থনা করেন। সিরহিন্দপতি ব্যয়স্বরূপ বিশ সহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিলে, বর্দ্ধিত-সাহস কহ্‌লুর-পতি পুনরায় গুরুকে আক্রমণ করেন। এবার শিখেরা বিশেষ শৌর্য্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গোবিন্দ দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং সুবিধা পাইলেই হঠাৎ রাজাদিগের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগের রসদাদি লুঠ করিয়া লইতেন; কিন্তু কতকাল এইরূপ ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া থাকা সম্ভব! ক্রমেই দুর্গে রসদাদির অভাব হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, 'মুষ্টিভর চানা' মিলাও দুষ্কর হইয়া উঠিল। তখন গোবিন্দ উপবাস-কাতর শিখদিগকে লইয়া দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শতদ্রু পারে বসোহলী রাজ্যে পলাইয়া যান। বসোহলীরাজ মহা সমাদরে গুরুকে অভ্যর্থনা করিলেন।

মোগলের নিকট সাহায্য-প্রাপ্তি

গোবিন্দের পরাভব

বসোহলীতে কিছুদিন থাকিতে থাকিতেই বৈশাখী সংক্রান্তি মেলার দিন উপস্থিত হয়। 'রবালসর' নামক স্থানে যাইয়া গোবিন্দ এই মেলা সম্পন্ন করেন। এই সময় বহু সহস্র শিখ তথায় সমবেত হইয়া গুরুর চরণ বন্দনা করে। গুরু তখন তাহাদিগের সাহায্যে অতি অল্পদিন মধ্যেই আনন্দপুর জয় করিয়া ফেলিলেন। *

আনন্দপুর পুনরধিকার

* ১৭৫৮ বিক্রম সম্বতে (১৭০১ খৃঃ) এই ঘটনা ঘটে।

দুর্গ-সংস্কার ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহোদ্দেশ্যে গোবিন্দ আনন্দপুরে এক বিরাট্ মেলার অধিবেশন করিলেন। এই মেলায় গুরু স্বীয় পুত্রচতুষ্টয়ের অমৃতসংস্কার বা দীক্ষা-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পুত্রদিগের পহল ক্রিয়া

এই সকল ঘটনা সুসম্পন্ন হইয়া গেলে গোবিন্দ রাজ্য পরিভ্রমণে বহির্গত হন। নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে গুরু চমকৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে অবস্থানকালে, গোবিন্দ একদা সংবাদ পাইলেন যে, হৈদরবেগ ও অলফ খাঁ নামক দুইজন সেনাপতি দ্বিসহস্র পদাতি সহ লাহোরে গমন করিতেছেন। গোবিন্দ তখন আর কালব্যয় না করিয়া সসৈন্যে তাঁহাদিগের উপর আপতিত হইলেন। উভয় পক্ষে বেশ এক সংঘর্ষ হইয়া গেল। গোবিন্দ তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের রসদাদি লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। মোগলেরা নতমুখে লাহোরে পলাইয়া গেল।

রাজ্য-পরিভ্রমণ

মোগল-দিগকে হঠাৎ আক্রমণ

অতি অল্পকাল মধ্যে গোবিন্দ স্বীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হওয়ায় পার্ব্বত্য রাজন্যবর্গ বড়ই ভীত হইয়া উঠিলেন। তারপর হৈদরবেগাদির পরাভবে তাঁহাদিগের সে ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। পাছে গোবিন্দ এইবার তাঁহাদিগের সকলকে রাজ্যচ্যুত করেন, এই ভয়ে তাঁহারা সকলেই পুনরায় একত্রিত হইয়া গোবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একযোগে মোগলের শরণাপন্ন হইলেন। ঔরঙ্গজেবকে আপনাদিগের দুরবস্থার কথা লিখিয়া শিখগুরুর শক্তি নষ্ট করিবার

রাজগণের ভয়

জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিয়াও তাঁহারা স্থির হইতে পারিলেন না, অজমেরচন্দ্রকে আপনাদিগের প্রতিনিধি পদে বরণ করিয়া সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ যে তাঁহাদিগের সহিত অকৃত্রিম বন্ধুত্ব-সূত্রে পুনঃ বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা এ কথা ভুলিয়াও একবার স্মরণ করিলেন না।

মোগলের শরণ গ্রহণ

ছিদ্রান্বেষী ঔরঙ্গজেব শিখগুরুর গর্ব্ব নষ্ট করিবার জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া বড়ই মনঃক্লেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এক্ষণে পার্ব্বত্য রাজাদিগকে স্বদলে প্রাপ্ত হইয়া তিনি আবার শিখশক্তি দমনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিলেন। বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে স্বীকৃত না হইয়া সম্রাট্ শিখগুরুর বিরুদ্ধে রাজাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লাহোরের শাসনকর্ত্তা জবরদস্ত খাঁ ও সিরহিন্দপতি সামসুদ্দিন খাঁকে বিশেষভাবে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই আমিরদ্বয় অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলেন। পার্ব্বত্য রাজারাও সসৈন্যে তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিলেন। ১৭৫৯ বিক্রম সম্বতের ১৩ই ফাল্গুন (১৭০৩ খৃঃ) অকস্মাৎ এই বিপুলবাহিনী গোবিন্দের মুখওয়াল দুর্গ অবরোধ করিল। শুনা যায়, ঔরঙ্গজেব কেবল সেনাপতিদিগের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া আপনার এক পুত্রকেও এই যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শিখদমনের জন্য মোগলের যুদ্ধযাত্রা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুখওয়ালের যুদ্ধ

এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াও গোবিন্দ মুহ্যমান হইলেন না। ক্ষত্রিয়োচিত বীর্য্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। স্বাভাবিক দার্ঢ্য সহ-কারে তিনি সগর্ব্বে মোগলের গতি প্রতিহত করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সে ভীষণ সাহস দেখিয়া তুর্কসৈন্যেরা স্তব্ধ হইয়া গেল। শতাব্দী পূর্ব্বের একটি অদ্ভুত কাহিনী তাহাদের মনে পড়িয়া গেল।

গোবিন্দের আত্মবিশ্বাস

সমগ্র রাজপুতনার রাণাদিগের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া মহাত্মা প্রতাপসিংহও একবার এইরূপ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আর আজ গোবিন্দসিংহ বিপদ্-কালে যাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন, সেই সকল কাপুরুষ রাজন্যগণ কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে ও অকস্মাৎ পরিত্যক্ত হইয়াও আপনাকে শক্তিহীন বিবেচনা করিতে পারিলেন না। স্বাধীনতা-মন্ত্রে উদ্বোধিত নব-ক্ষত্রিয় শিখেরাই তাঁহার একমাত্র সহায়। তিনি সেই অমিত-তেজা সহায়ের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্।

অচিরে দুর্গের বাহিরে শিখ-মোগলে প্রবল সংঘর্ষ হইল। সে সংঘর্ষে উভয়ে উভয়েরই শক্তির পরিচয় পাইলেন। সাত মাস ব্যাপিয়া অনবরত এই ঘোর যুদ্ধ চলিল। বিজয়-লক্ষ্মী সর্ব্বদাই চঞ্চলা। তিনি

কখনও গোবিন্দকে, কখন বা মোগলকে মাল্যদানে বিভূষিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু গোবিন্দ যতই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন না, যতই যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করুন না, তথাপি বিপুল মোগল সৈন্যের তুলনায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প। অল্প সৈন্য লইয়া মহাবীর গোবিন্দ সিংহ সাত মাস মোগলদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। শেষে আর পারিয়া উঠিলেন না। তখন তিনি স্বীয় সুদৃঢ় মুখওয়াল দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মোগলেরা দুর্গাবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল।

মুখওয়াল যুদ্ধ

অপেক্ষাকৃত

দুর্গাবরোধ

দুর্গমধ্যে যে রসদ ছিল, তাহাতে কয়েক দিন মাত্র চলিল। পরে খাদ্যের বড়ই অভাব হইতে লাগিল দেখিয়া সকলে ভীত হইল। সমর-ক্লান্ত নৈরাশ্য-পীড়িত সৈন্যেরা গুরুকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, এরূপ সঙ্কল্প করিল। ইত্যবসরে গুরুমাতা গুজরী স্নেহাধিক্যবশতঃ হঠকারিতার যে পরিচয় দিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সমগ্র শিখ-সমাজের মর্ম্ম-বিদারক ক্ষতি হইয়াছিল।

শিখসৈন্যের অসন্তোষ

রসদ-অভাবে গোবিন্দ সিংহ যে বহুদিন দুর্গ স্বাধিকারে রাখিতে সমর্থ হইবেন, এ বিশ্বাস গুরুমাতার ছিল না। দুর্গ মোগলের হস্তগত হইলে, গুরু-পরিবারের কেহই তাহা-দিগের নির্ম্মম হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন না। গোবিন্দের চারিটি পুত্র। সকলেই অল্পবয়স্ক। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ দুইটি নিতান্ত বালক। তাহাদের বয়ক্রম আট দশ বর্ষের অধিক ছিল না। গুরু-মাতা বংশরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অনেক

গুরুমাতা গুজরী

চিন্তার পর গোপনে দুর্গ ত্যাগ করাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া মাতা অবরোধকারী হিন্দু রাজাদিগের নিকট নিতান্ত গুপ্তভাবে এক 'ছাড়পত্র' প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা রক্ষিত হইলে, গুরুমাতা একদা গোবিন্দের দুই কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া রাত্রিকালে দুর্গত্যাগ করিলেন। পাচক গঙ্গু তাঁহার একমাত্র সহগামী হইল। গুরুমাতা সিরহিন্দে যাইয়া গঙ্গুর গৃহে লুকাইয়া রহিলেন।

গুরুমাতার দুর্গত্যাগ

যথাকালে গোবিন্দ মাতার এরূপ অন্যায় ব্যবহারের কথা জানিতে পারিলেন। দুঃখে ও ক্রোধে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আমায় তিনি ত্যাগ করিলেন! কিন্তু কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? তাঁহার সাধের পৌত্রদিগকেই বা কি করিয়া রক্ষা করিবেন? তাহারা যে নিশ্চয়ই মোগলের অত্যাচারে দেহত্যাগে বাধ্য হইবে!' তখনই গুরু, মাতার সন্ধানে, চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন।

গোবিন্দের অন্তর্বেদনা

গোবিন্দের কঠোর ভবিষ্যদ্বাণী অচিরেই ফলিয়াছিল। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, পাচক গঙ্গুর বিশ্বাসঘাতকায় তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। গঙ্গু ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ক। অর্থের লোভে সে গুরুপুত্রদিগকে ধরাইয়া দিল। বিশ্বাসঘাতকের অভাব আমাদের দেশে কোন কালেই নাই। যে দেশের রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থে এবং অপরাপর শ্রেষ্ঠ কাব্যাবলীতে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণকে ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে; বিশ্বাসঘাতক রাজবংশের গুণ বর্ণনা করিবার জন্য যে দেশে একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যের উৎপত্তি ঘটিতে পারে, সে দেশে

ব্রাহ্মণ-কলঙ্ক পাচক গঙ্গু

বিশ্বাসঘাতক জন্মিবে না ত' কোথায় জন্মিবে! এইরূপ বিশ্বাস-ঘাতকদিগকে প্রশ্রয় প্রদান করায় দেশের কত যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। ভারতের পতনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ইতিহাস কঠোর-স্বরে আমাদিগকে জানাইয়া দেয়, এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতাই দেশের অধঃপতনের প্রধানতম কারণ।

বিশ্বাসঘাতক

মোগলেরা বালকদিগকে ধৃত করিয়া প্রথমতঃ অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করিল; পরে সিরহিন্দপতি নবাব বাজিদ খাঁ সামান্য বিচারের ভাণ করিয়া ঔরঙ্গজেবের আদেশ মত তাঁহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দান করিলেন। দণ্ডদানের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য একবার বিশেষ চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বালকেরা সিংহ-শিশু। তাঁহারা কোন প্রলোভনেই মুগ্ধ হইলেন না; অধিকন্তু নানা মানবোচিত বাক্যে নবাবকে তিরস্কার করিলেন। নবাব সে তিরস্কার সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ক্রুদ্ধ হৃদয়ে বীর বালক-দিগকে প্রাচীরমধ্যে জীবন্ত গ্রথিত করিয়া ফেলিলেন।

সিংহ-শিশু

এই মর্ম্ম-বিদারক শোকাবহ কাহিনী গুরুমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি সে শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে বালকেরা যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। যদি যৌবনপ্রাপ্তি তাঁহাদিগের পক্ষে কখন সম্ভব হইত, তবে তাঁহারা ভারতেতিহাসের এক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

গুরুমাতার দেহত্যাগ

আবার, সৈন্যগণও এদিকে গোবিন্দকে ত্যাগ করিতে উৎসুক।

যাহাতে তাহারা এরূপ অন্যায় কার্য্য না করে, এজন্য গোবিন্দ তাহাদিগকে কত বুঝাইলেন ; কিন্তু সবই বৃথা হইল। 'কাপুরুষ' অভিধানে ভূষিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে কত তিরস্কার করিলেন, তথাপি তাহারা মন পরিবর্ত্তন করিল না। তখন তিনি তাহাদিগকে আবার বুঝাইলেন —'দেশের জন্য মরিলে সুখ ও পুণ্য অনেক। যদি আমরা বীরের মত মরিতে পারি, তবে আমাদিগের নাম সকলে সম্মানের সহিত স্মরণ করিবে। আর যদি জয়ী হইতে পারি, তবে দেশ ত' আমাদের। কাপুরুষের ন্যায় মরা অতি হীন ও ঘৃণাস্পদ—যোদ্ধার মত মরাই গৌরবময় !' দুর্গদ্বার খুলিয়া তিনি আর একবার মোগলদিগকে শেষ আক্রমণ করিবেন ভাবিলেন ; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টগতি বিভিন্ন পথে চলিয়াছে,—কেহই তাঁহার সে প্রস্তাবে সম্মতি দিল না। অধিকন্তু সৈন্যেরা পত্রযোগে গোবিন্দকে জানাইল, যে তাহারা আর তাঁহার আদেশ মান্য করিতে সম্মত নহে। তাহারা দলে দলে দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ক্রমে দুর্গ সৈন্যশূন্য হইয়া পড়িল। কেবল চল্লিশটি মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর কিছুতেই দুর্গত্যাগ করিল না।

শিখদিগকে তুষ্ট করিবার বৃথা প্রয়াস

সৈন্যদিগের দুর্গত্যাগ

নির্ব্বোধ সৈন্যদিগের এরূপ অভাবনীয় ব্যবহারে গোবিন্দ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া গুরু তাহাদিগের উদ্দেশে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে অবশিষ্ট কয়জনও অচিরে দুর্গত্যাগ করে, এজন্য তাহাদিগকে ক্রোধভরে আদেশ করিলেন। কিন্তু গুরুভক্ত অনুচরেরা গুরুর মানসিক আবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কোন মতেই তাঁহার

গোবিন্দের বিরক্তি

সঙ্গ ত্যাগে সম্মত হইল না ; বরং দৃঢ়তার সহিত বলিল—"আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের বিশেষ কোন উপকার হইবে না। আপনারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা আমাদের শির দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।" বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদিগকে গোবিন্দ যাহাতে ক্ষমা করেন, এজন্য তাহারা তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল। তাহাদিগের এরূপ অকৃত্রিম ভক্তিতে প্রীত হইয়া গোবিন্দ সৈন্যদিগের সকল অপরাধ ভুলিয়া গেলেন। সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন।

চত্বারিংশৎ শিখসৈন্য

গুরু ক্ষমা করিলেন বটে ; কিন্তু গুরুর উপরও একজন গুরু আছেন। তিনি কিন্তু ক্ষমা করিতে পারিলেন না। সৈন্যেরা মুখওয়াল দুর্গ ত্যাগ করিবামাত্র মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সে সংঘর্ষে বহুসংখ্যক শিখ হত হইল, অবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র পলাইয়া কোনরূপে জীবন রক্ষা করিল।

পলায়িত শিখ-সৈন্য

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চমকৌড় দুর্গ

মুখওয়ালের যুদ্ধে গোবিন্দ হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলেন—তাঁহার যতদূর ক্ষতি হওয়া সম্ভব, তাহাই হইল। প্রধান সহায় শিখগণ সামান্য প্রাণের মায়ায় কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল; মোগলের অন্যায় অত্যাচারে স্নেহময়ী মাতা ও দুই পুত্র দেহত্যাগ করিলেন। এরূপ নানা ভয়াবহ বিপদ সত্ত্বেও গোবিন্দ আশা-শূন্য হইলেন না। হৃদয়ের অন্তঃস্তলে তিনি যে আকাঙ্ক্ষা সাগ্রহে পোষণ করিতেছিলেন, কোন ক্রমেই তাহা নষ্ট হইতে দিলেন না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তিনি যাহা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যত বিলম্বেই হউক, তাহা পূর্ণ হইবেই। এ যজ্ঞ সাধনের জন্য অনেক মহার্হ বলি উৎসর্গ করিতে হইবে। মাতা ও দুই পুত্র সে যজ্ঞের সামান্য বলি মাত্র। ফলে, এই সকল বিপদেও তাঁহার প্রাণে নৈরাশ্য জন্মিতে পারিত না, প্রত্যুত তাঁহার হৃদয় উৎসাহে ভরিয়া উঠিত।

গোবিন্দের সাধনা

সৈন্যগণ চলিয়া যাইবার অনতিবিলম্বেই গোবিন্দ মুখওয়ালে সময়ক্ষেপ বৃথা বিবেচনা করিয়া দুর্গ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোগলেরা গোবিন্দের অবস্থা সম্যকরূপ জানিতে পারিলেই

পূর্ণোৎসাহে দুর্গে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইবে। তখন সেই অগণ্য মোগল সৈন্যের হস্তে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। কাজেই গোবিন্দ মধ্যরাত্রে অতি সন্তর্পণে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য চমকৌড় দুর্গে পলাইয়া গেলেন।

মুখওয়াল-দুর্গত্যাগ

চমকৌড় দুর্গে গোবিন্দের কতকগুলি সৈন্য পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত ছিল। এখন আরও কতিপয় ব্যক্তি গোবিন্দের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া চমকৌড় দুর্গে আশ্রয় লইল। গোবিন্দের সৈন্য-সংখ্যা কিছু হইল বটে; কিন্তু মোগলদিগের তুলনায় তাহা নগণ্য।

চমকৌড়

গোবিন্দ গুপ্তভাবে মুখওয়াল ত্যাগ করিলেও চারচক্ষুঃ শত্রুর চক্ষে ধুলি দিতে পারিলেন না। মোগলেরা অনতিবিলম্বে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গাবরোধ করিল। গোবিন্দ বাধ্য হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এখানে তিনি ৺ ভবানী নয়না দেবীর নিকট পুনরায় বল প্রার্থনা করেন।

পুনঃ অবরোধ

যতই দিন যাইতে লাগিল, গোবিন্দের কষ্টের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, রসদও ক্রমশঃ সেইরূপ হ্রাস পাইতে লাগিল। তখন গোবিন্দ 'মরিয়া' হইয়া উঠিলেন, সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"মৃত্যু ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। তোমরা সকলে হৃদয়ে সাহস আন ও বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হও। যদি আমি ভাগ্যক্রমে না মরি, তবে জানিও তোমাদের কাহারও মৃত্যু অপ্রতিহিংসিত থাকিবে না।" উৎসাহে শিখেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

রসদের অভাব

অবরোধকারী মোগল-সৈন্যের নেতা ছিলেন—খোজা মহম্মদ ও নহর খাঁ। গোবিন্দকে বশীভূত করিবার জন্য ও আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ দিয়া তাঁহারা দুর্গে এক দূত পাঠাইলেন। দূত যাইয়া সগর্ব্বে গোবিন্দকে বলিল—'অবরোধকারী সৈন্যেরা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দেশীয় রাজার অনুচর নহে। তাহারা সকলেই মহা প্রতাপশালী সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সৈন্য। সুতরাং সম্রাটের প্রতি সম্মান দেখাইয়া বশ্যতা স্বীকার কর ও সত্য ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হও।' দূত 'গায়ে পড়িয়া' অনাবশ্যক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল,—'আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দাও। সত্য ধর্ম্মের প্রতি তোমাদিগের যে অন্যায় বিরাগ ভাব আছে, তাহাও দূর কর। এরূপ অসম যুদ্ধে তুমি কখনই জয়ী হইবে না, তবে আর কেন?'

মোগল দূত

গোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র বালক অজিত সিংহ এই সময় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্ম ও নেতার নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। দূত—দৌত্য সম্পন্ন করাই তাহার কার্য্য। এরূপ ভাবে ধর্ম্মে কটাক্ষপাত করিবার বা নেতাকে নিন্দা করিবার তাহার কি অধিকার? সরোষে অজিত সিংহ অসি কোষমুক্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'সাবধান! আর একটি কথা কহিলেই তোমার মস্তক দেহচ্যুত হইবে। আমাদের নেতাকে এরূপভাবে উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা তুমি রাখ! কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।' ক্রোধে মোগলদূতের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এইরূপে অপমানিত হইয়া সে ভীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক মোগল শিবিরে প্রস্থান করিল।

অজিত সিংহ

ভয় দেখাইয়া গোবিন্দকে বশীভূত করিতে পারা গেল না দেখিয়া, সেনাপতিদ্বয় আরও সতর্কতা ও দৃঢ়তার সহিত দুর্গাবরোধ করিলেন। ফলে উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এ যুদ্ধে সকলেই অমানুষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। গুরুপুত্র অজিত সিংহ ও জুঝার সিংহ * প্রকৃত সিংহ-বীর্য্য দেখাইয়া পিতার সমক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। শিখেরা এই যুদ্ধকাহিনী অতীব সম্মানের সহিত আজও স্মরণ করে। তাহাদিগের বিশ্বাস, গুরু-পুত্রদ্বয় নরদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যগতি প্রাপ্ত হন ও সূর্য্যলোকে চলিয়া যান।

চমকৌড় যুদ্ধ

শিখেরা এই যুদ্ধে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারা জানিত, এরূপ অসম যুদ্ধে তাহাদিগের জয়াশা আকাশকুসুমবৎ। একটি একটি করিয়া প্রায় সমস্ত শিখই হত হইল। স্বয়ং গোবিন্দও এ যুদ্ধে অল্প বীরত্ব দেখান নাই। সকলের সঙ্গে তিনি সমভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বহস্তে তিনি মোগল সেনাপতি নহর খাঁকে নিহত ও খাজা মহম্মদকে আহত করেন। কিন্তু গোবিন্দ যতই যুদ্ধ করুন না, তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কাজেই গোবিন্দ অবশিষ্ট পাঁচটি মাত্র অনুচর লইয়া তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রিতে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান।

গোবিন্দের পলায়ন

এই যুদ্ধে শিখবীর জীবন সিংহ অসীম বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন। হীন ঝাড়ুদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বীর মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। হল্‌দিঘাটের দৈলবারাধিপতি মহাপ্রাণ মান্নার ন্যায় তিনিও দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া

জীবন সিংহ

* এই সময় অজিতের বয়ঃক্রম সপ্তদশ ও জুঝারের ত্রয়োদশ বর্ষ হইয়াছিল।

গুরুর জীবন রক্ষার জন্য গুরু-বেশে মোগলদিগের উপর প্রবলভাবে আপতিত হইয়াছিলেন। মোগলেরাও গুরু-ভ্রমে তাঁহাকে প্রবল যুদ্ধে নিহত করে। বীর গুরুর জন্য অম্লানবদনে দেহত্যাগ করিলেন। শিখেরা তাঁহার মহত্ত্বের সম্মানের জন্য গুরু-পুত্রদিগের সমাধির পার্শ্বে তাঁহারও সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বীরের সম্মান বীরই বুঝে!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কঠোর পরীক্ষা

গোবিন্দ পলাইলেন বটে, কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আত্মীয়স্বজনেরা প্রায় সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রাণপ্রতিম পুত্রচতুষ্টয় অকালে কাল-কবলিত হইয়াছেন। শিখ সৈন্যগণ কেহ হত, কেহ বা পলায়িত হইয়াছে। রাজ্য ধন সমস্তই পর-হস্তগত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার হৃদয় নৈরাশ্যসাগরে নিমজ্জিত হইল না। এরূপ হীনবল আত্মীয়-সম্পদ-হীন হইয়াও তিনি স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সর্ব্বদাই তিনি হৃদ্‌কন্দরে স্বাধীনতার মোহিনী মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিতেন। এত অত্যাচার, এত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াও শিখধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবে, শিখ-সম্প্রদায় উঠিবে, ভারতাকাশে নবীন সূর্য্য উদিত হইবে, এ বিশ্বাস তিনি কোন ক্রমেই ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এজন্য কোন ইয়োরোপীয় গ্রন্থকার তাঁহাকে বিচারশক্তিহীন পাগল বলিয়াছেন।

গোবিন্দের আকাঙ্ক্ষা

গোবিন্দ বাস্তবিকই পাগল ছিলেন। কিন্তু সে পাগলামী বিচার-শক্তিহীনতার নামান্তর নহে। তাহা বিশেষরূপ বিবেচনার পর কার্য্য করিবার প্রবল ইচ্ছা। সে ইচ্ছাকে কোন বিপদের ভয় দেখাইয়া

বশীভূত রাখা যায় না। এরূপ পাগলামী ব্যতীত কোন মন্ত্র সাধন হইতে পারে না। এরূপ পাগলামী না জন্মিলে মানুষ জগতের কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এই পাগলামী জন্মিয়াছিল বলিয়াই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ জগতের ত্রাতা শ্রীবুদ্ধদেব নামে পরিচিত হইয়াছেন, সামান্য ব্রাহ্মণ-সন্তান শঙ্করাচার্য্য ভারতের নবযুগ আনিয়া চিন্তার স্রোত ফিরাইয়া দিয়া সকলের পূজ্য হইয়াছেন। এই পাগলামী ছিল বলিয়া শ্রীচৈতন্য নির্ব্বোধ মানবের চৈতন্য সম্পাদনের সরল পন্থার উদ্ভাবন করেন, নানক হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়-ক্ষেত্র শিখ-ধর্ম্মের আবিষ্কার করেন। এই পাগলামীর অধিকারী হওয়ায় প্রতাপসিংহ—প্রতাপসিংহ হইতে পারিয়াছিলেন, শিবজী ভারতের নবযুগের আদর্শ পুরুষ হইতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রবল দুর্দ্দান্ত মোগলের বিরুদ্ধে যে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছিলেন, তাহাও এই পাগলামীর পরিচায়ক। এরূপ পাগলামীই মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলে। পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তির জন্মদাতা এই পাগলামীই। পরের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গই প্রকৃত যজ্ঞ। এরূপ যজ্ঞকেই মনীষীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া থাকেন। মহাত্মা গোবিন্দ সিংহও এরূপ যজ্ঞের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পাগলামী সাধারণ পাগলের পাগলামী নয় তাহা ভক্ত কর্ম্মবীরের কর্ম্মোন্মাদনা। এরূপ পাগলামীই সর্ব্ব দেশের—সর্ব্ব জাতির আদর্শ হওয়া উচিত।

পাগলামী

পাগলামী ও কর্ম্মোন্মাদনা

যাহা হউক, গোবিন্দ দুর্গ ত্যাগ করিয়া চিন্তিত মনে অগ্রসর হইতেছিলেন। দুর্গ হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে দুইটি পাঠানের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই পাঠানেরা পূর্ব্বে এক সময় গোবিন্দের নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল। এখন তাহারা তাঁহার শত্রুপক্ষের অনুচর হইলেও, তাঁহার সে দয়ার কথা ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার দর্শন পাইয়া তাহারা অত্যন্ত প্রীত হয় ও তাঁহার উপকার করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। গোবিন্দও এক্ষণে তাহাদের সাহায্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাহারা তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া চলিল। ক্রমে তাঁহারা শত্রুর শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলে জনৈক প্রহরীর সন্দেহ হয়। সে তাঁহাদিগের পরীক্ষার জন্য আলো আনিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহারা তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া লুধিয়ানা জিলার অন্তর্গত বেহ্লালপুরে উপস্থিত হন।

দুই জন পাঠান

বেহ্লালপুরে আসিয়াই গোবিন্দ কাজী মীর মহম্মদ নামক জনৈক সদাশয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে গোবিন্দকে কোরাণ ও অন্যান্য মুসলমানী শাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন। বহুকাল পরে গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া মীর মহম্মদ পরম প্রীত হইলেন; কিন্তু গোবিন্দের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা জানিয়া তাঁহার হৃদয় শীঘ্রই চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণেক চিন্তার পর তিনি মোগল চরদিগের চক্ষু এড়াইবার জন্য গুরুকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সময় বেহ্লালপুরে এক দল মোগল সৈন্যও উপস্থিত ছিল। কোনক্রমে গুরুর আগমন বার্ত্তা তাহাদিগের কর্ণ-গোচর হইলেই গোবিন্দের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। গোবিন্দও মীর মহম্মদের উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে শিখ পোষাক পরিত্যাগ করত মুসলমানী পোষাক

মীর মহম্মদ

নীল বস্ত্রে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া মস্তকের কেশ এলাইয়া দিলেন। দীক্ষার পর হইতেই এই কেশ সর্ব্বদা বাঁধা থাকিত। সর্ব্বক্ষণ কেশ আলুলায়িত রাখা শিখ-দিগের বিধি-বিগর্হিত কার্য্য। বিপদে পড়িয়া আজ গোবিন্দকে শিখদিগের চিরন্তন প্রথা লঙ্ঘন করিতে হইল। বিপদ্ কালে সকল প্রথা নির্ব্বিরোধে পালন করা বড়ই দুরূহ।

গোবিন্দের বেশ-পরিবর্ত্তন

মুসলমান দরবেশ সাজে সজ্জিত হইয়া সানুচর গোবিন্দ পরম-উপকারী মীর মহম্মদের নিকট কৃতজ্ঞান্তঃকরণে বিদায় লইয়া মাছিওয়াড়া সহরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে মোগলেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; তিনিও তাহাদিগের হস্তে ধৃতপ্রায় হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার বেশ ও দীর্ঘ কেশ দেখিয়া প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। মোগলেরা তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। মীর মহম্মদের উপদেশক্রমে গুরু এ যাত্রা ও আরও বহুবার রক্ষা পাইয়াছিলেন।

মোগল সৈন্যের বিষম ভ্রম

মাছিওয়াড়ায় গোবিন্দের একটি ক্ষত্রিয় শিষ্যের বাটী ছিল। তাহার নাম গুলাব (গোলাপ) সিংহ। গুলাবের বাটীর সন্নিকটেই একটি মস্জিদ ছিল। সেই মস্জিদের মোল্লা বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অন্ধবিশ্বাসী ছিল। গোবিন্দ যখন সেই মস্জিদের পার্শ্ব দিয়া শিষ্য-গৃহে গমন করিতেছিলেন, সেই সময় মোল্লা কোনক্রমে তাঁহাকে শিখ-গুরু বলিয়া জানিতে পারে। শিখ-গুরুর সর্ব্বনাশ করিবার জন্য তখন তাহার পাপ-প্রবৃত্তিচয় সহসা

ধর্ম্মান্ধ মোল্লা

উত্তেজিত হইয়া উঠায় সে গোবিন্দকে অনর্থক নানা কটূক্তি করিতে থাকে। তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহার দেখিয়া গোবিন্দ চঞ্চল হইলেন। মোল্লাকে শাস্তি দিবার অবসর বা ক্ষমতা তখন তাঁহার ছিল না। কাজেই গুলাব তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু সে কোনক্রমেই শান্ত হইল না; প্রত্যুত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, হয় সে গুরুকে আজ মুসলমান করিবে, নয়, অন্ততঃ গোমাংস ভক্ষণ করাইয়া তাঁহাকে ব্রতচ্যুত করিবেই করিবে।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মোল্লা তখনই একটি গোবধ করত তাহার কিয়দংশ রন্ধন করিয়া গুরুকে আহারার্থ প্রদান করিল।

মোল্লার কাপুরুষতা

আরও, শপথ করিয়া বলিল, গুরু যদি তাহা ভোজন না করেন, তবে সে তাঁহাকে হত্যা করিবে। মোল্লা বল-প্রকাশ করিয়াই ধর্ম্মসঞ্চয়ে অগ্রসর হইল। এইরূপ স্বাধিকারে পাইয়া অসহায় শত্রুর উপর বলপ্রকাশ নিতান্তই কাপুরু-ষোচিত। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিরা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া বাহ্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া উঠে। কাফের-বিনাশ মুসলমান শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও, এরূপভাবে অত্যাচার কোন মতেই শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে না। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কর্ম্ম করাকে মুসলমান শাস্ত্র অতীব নিন্দা করে। এইজন্যই মহাত্মা আলি পদানত শত্রুকে বধ করিতে যাইয়াও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। শত্রু তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্ত করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সময় ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ এই তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া অন্যায়ভাবে বিধর্ম্মীদিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত শাস্ত্রানুষ্ঠান ত্যাগ

করিয়া শাস্ত্রের নামে অন্যায় আচরণ ধর্ম্ম বলিয়া তদবধি মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়া উঠে। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের নৈতিক অধঃপতন আরব্ধ হয়।

গোবিন্দের মাংস ভক্ষণ

এরূপ বিষম বিপদে পড়িয়া গোবিন্দ কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া একটু গোলে পড়িলেন। ক্ষণেক মাংসটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া গুরু লৌহছুরিকা দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করত ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।

রাষ্ট্রনীতিক গোবিন্দের এরূপ আহার সাধারণ শিখ-রীতির বিপরীত সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় গোমাংসাহার করিয়াও

সামাজিক রীতি

যদি অনাবশ্যক মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে ক্ষতি কি? যে জীবন সামান্য স্বার্থের বহু উচ্চে অবস্থিত, দেশের রাষ্ট্রগতি পরিবর্ত্তন করাই যে জীবনের উদ্দেশ্য, সর্ব্বদাই তাহা আচার দ্বারা নিয়মিত হইতে বাধ্য নহে। আচার জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই স্থিরীকৃত; কিন্তু যখন তাহা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠে, তখনও তাহা পালন করা সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে। গোবিন্দের এরূপ আহারে বাস্তবিকপক্ষে শিখ-সমাজের কোনই ক্ষতি হয় নাই, প্রত্যুত বিশেষ প্রয়োজন স্থলে গোমাংস ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এজন্যই শিখরাজ বান্দা দুর্গাবরুদ্ধ হইলে রসদ অভাবে গোমাংস আহার করিয়া জীবন রক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুক্তসর

পরদিন প্রাতে গোবিন্দ এই ঘৃণ্য সহর ত্যাগ করিয়া লুধিয়ানা হইতে দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী কন্নীজা নামক এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গোবিন্দের এক শিষ্যের বাটী ছিল। গোবিন্দ তাহার নিকট একটি অশ্ব যাচ্ঞা করিলেন; কিন্তু সে গুরুদ্রোহী মোগলের অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার সে যাচ্ঞা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইল না। গুরু তখন বিষণ্ণ মনে অন্যত্র গমন করিলেন। কিন্তু তিনি যাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, সকলেই মোগলের অত্যাচার স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তখন অসহায় গোবিন্দ গুপ্তভাবে জলন্ধর দোয়াবের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন স্থানেই তিনি অধিক দিন অবস্থান করিতেন না। এইরূপে পাতিয়ালা রাজ্যেরও প্রায় সমস্ত স্থানই তিনি পরিদর্শন করেন।

শিখদিগের গুরুদ্রোহ

এইরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে গুরু রৈকোট হইতে পঞ্চ-ক্রোশ দূরবর্ত্তী জলপুরা নামক এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় আট দিন অবস্থান করেন। পরে স্বীয় বেশ ধারণ করিয়া ভতিন্দার জঙ্গল-অঞ্চলে প্রস্থান করেন। এই অঞ্চলে হরগোবিন্দ ও তেগ

বাহাদুরের বহু শিষ্য ছিল। গুরুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাহারা দলে দলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। পূর্ব্বে তাহারা শুনিয়াছিল যে, তিনি চমকৌড়ে হত হইয়াছেন। এখন সে সংবাদ মিথ্যা জানিয়া তাহারা আনন্দ ও সমমর্ম্মিতা প্রকাশের সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না।

জলপুরা-গ্রামে অবস্থান

এই ভ্রমণকালে গোবিন্দকে নানারূপ ক্লেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অনুসরণকারী মোগলের জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। আবার বিপদ্‌কালে স্বকীয় শিষ্যেরাও তাঁহাকে সামান্যমাত্র সাহায্য করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাকে কত দিন অনাহারে, কত দিন বা সামান্য শষ্পরুটি মাত্র * আহার করিয়াই কাটাইতে হইয়াছে। ফলে গোবিন্দ কোট কাপুরায় উপস্থিত হইয়াই অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যলাভের জন্য তাঁহাকে এইস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিতে হয়।

গোবিন্দের নানা ক্লেশ

সৈন্য সংগ্রহের জন্য গোবিন্দ সর্ব্বদাই চেষ্টাপর ছিলেন। প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাতর হইত; কিন্তু এত কাল সে সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। গোবিন্দের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও কেহই তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু অদম্য চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফল অতীব বিস্ময়াবহ। এই অঞ্চলে অবস্থানকালে গোবিন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল। পদাতিকে ও অশ্বারোহীতে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য তাঁহার

সৈন্য সংগ্রহ

* "শাহিদান সাদিক" শীর্ষক উর্দ্দু গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'মহতাব সিংহ' নামক খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পতাকাধীন হইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। আনন্দে গুরু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

গোবিন্দের এই সৈন্য-সংগ্রহ ব্যাপার অচিরেই মোগলদিগের কর্ণগোচর হইলে, তাহারা তাঁহার অধ্যবসায় স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইল। তখন তাঁহার শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে মহা উৎসাহ পড়িয়া গেল। সিরহিন্দপতি সত্বর সপ্ত সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোবিন্দের বিরুদ্ধে সগর্ব্বে যাত্রা করিলেন। গুরুও তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া এক মরুক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ পূর্ব্বক মোগল সেনাপতির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মোগলের যুদ্ধযাত্রা

অচিরেই সিরহিন্দপতি সেই মরুস্থলে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু গুরুকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ একদল শিখ কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া মোগলদিগের উপর আপতিত হইল। এই সকল শিখই পূর্ব্বে গোবিন্দের আদেশ অমান্য করিয়া মুখওয়াল দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুর সমূহ বিপদের মূলীভূত কারণ হইয়াছিল। গৃহে আসিয়া তাহারা আপনাদের ভ্রম উপলব্ধি করিয়া অন্তর্দাহে জ্বলিতেছিল। তাহাদের সেই মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাহারা —সংখ্যায় অতি সামান্য—৪০ জন মাত্র হইলেও—অকস্মাৎ গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া বীর বিক্রমে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের এরূপ আক্রমণের জন্য মোগল সেনাপতি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তাঁহাকে একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়;

পলায়িত শিখদিগের প্রায়শ্চিত্ত

কিন্তু সে ক্ষুদ্র শক্তি অগণ্য মোগল সৈন্যদিগের নিকট কতক্ষণ স্থির থাকিবে? অল্পক্ষণ মধ্যেই শিখ বীরেরা যুদ্ধ করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করত পূর্ব্ব পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিল। তাহাদের সে সাহস ও উন্মাদনা দৃষ্টে মোগলপতি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

দূরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দও এই অপূর্ব্ব যুদ্ধ-ক্রিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। এই অপরিচিত শিখ সৈন্যেরা কোথা হইতে এবং কেন এরূপভাবে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল, জানিবার জন্য গুরু বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সে ঔৎসুক্য নিবারণের উপায় নাই। এখনই মোগলশক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। গোবিন্দের সৈন্যেরা আত্মরক্ষার জন্য স্থির হইয়া রহিল। অপরিচিত শিখদিগের আত্মদান সন্দর্শনে তাহা-দের উৎসাহ শত গুণে বৃদ্ধি পাইল। জয়শ্রী কিম্বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। 'সতি শ্রী অকাল' 'শ্রীবাহি গুরুজীকে ফতে' প্রভৃতি নিনাদ দ্বারা তাহারা মোগল সৈন্যদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিল। অচিরেই শিখে-মোগলে ভীষণ সংঘর্ষ হইল। সে সংঘর্ষে বিলাসপরায়ণ মোগল সৈন্যেরা পরাভূত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু তাহাদের সে পলায়ন বড় সুখের হয় নাই—জলাভাবে তাহাদিগকে বিষম যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছিল। সে মরুস্থলে যথেষ্ট জলাশয় ছিল না। যাহাও দুই একটি ছিল, গোবিন্দ পূর্ব্বাহ্নে সে সমুদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। মোগলদিগের সঙ্গে যে জল ছিল, রণস্থলে আসিবার পূর্ব্বেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়। যুদ্ধকালে তাহাদিগের পিপাসা প্রবল হইয়া উঠিলেও, তাহারা

শিখ-মোগলে সংঘর্ষ

মোগলের পরাজয়

কোনক্রমে জল সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদিগের এরূপ ক্লান্তিই তাহাদিগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। *

যুদ্ধশেষে গোবিন্দ আহত সৈন্যদিগের সেবার জন্য যুদ্ধে পতিত প্রত্যেক সৈন্যের নিকট গমন করত তাহাদের পরীক্ষা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে গোবিন্দ অপরিচিত শিখ সৈন্যদিগের শবের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাহাদিগের কেহই জীবিত নাই, কেবল এক জনের সামান্য নিঃশ্বাস বহিতেছে—এখনও তাহার জীবন-বায়ু নিঃশেষিত হয় নাই। গুরু সাগ্রহে তাহার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্পৃষ্ট হইয়া শিখ নয়ন মেলিয়া গুরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। গুরু সে কটাক্ষ লক্ষ্য করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাহা বড়ই কাতরতাব্যঞ্জক। মুমূর্ষু শিখ, গুরুকে চিনিতে পারিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে আত্ম-পরিচয় দিয়া অবাধ্য শিখ-দিগকে ক্ষমা করিবার জন্য নিবেদন করিল। গুরু তাহাদের প্রায়শ্চিত্তে বিস্মিত হইয়া তাহাদিগের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গুরুর আশীর্ব্বাণী শুনিতে শুনিতেই বীরের নয়নদ্বয় চিরতরে মুদিয়া গেল!

গুরুর শিখ শুশ্রূষা

মুমূর্ষু শিখের একান্ত প্রার্থনা

যুদ্ধ জয় করিয়া গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার নাম দিলেন—মুক্তসর। এই মুক্তসর হইতেই ঐ স্থানের নাম শেষে মুক্তসর হইয়াছে। পূর্ব্বে অন্য কোন নাম ছিল।

* ১৭৬২ বিক্রম সম্বতের (১৭০৬ খৃঃ) মাঘ মাসের প্রথম দিবসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুক্তসর এক্ষণে শিখদিগের একটি প্রধান তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বর্ষ মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলার অধিবেশন হয়। এই সরোবরের নাম মুক্তসর কেন হইল, তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে শুনা যায়, গোবিন্দ বলিয়াছিলেন যে, এখানে বহু লোক মুক্তি পাইয়াছেন, তজ্জন্য সহরের এই নাম রাখা হইয়াছে। বোধ হয়, যুদ্ধে মৃত শিখদিগের স্মৃতিরক্ষার জন্য এবং অপর সকলকে উত্তেজিত করিবার মানসে ঐ সুন্দর নাম প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

মুক্তসর

যুদ্ধহত ব্যক্তিদিগের স্মৃতিরক্ষা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজধানীর পথে

মুক্তসরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া গুরু দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজধানী আনন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গুরু মালবা প্রদেশস্থ একটি গ্রামের অনুপম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় কিছুকাল বাস করেন। তাঁহার বাসের জন্য যে আবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, 'দমদমা সাহিব' নামে তাহা শিখ-সমাজে পরিচিত। এই আবাস হইতেই গ্রামটিও ক্রমে দমদমা সাহিব বা সামান্যতঃ দমদমা নামে অভিহিত হইতে থাকে। শিখেরা এই স্থানটিকে একটি পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য করে। তাহাদিগের বিশ্বাস, ইহা ৺বারাণসীর ন্যায় পবিত্র। এখানে বাস করা অতীব সৌভাগ্য ও পুণ্যের বিষয়। অতি মূর্খ ব্যক্তিও এই স্থানে বাস করিলে জ্ঞান লাভ করিবে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইজন্যই নানা দেশ হইতে শিখেরা আসিয়া এই স্থানে বাস করে। স্থানটি বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার কবিরা পঞ্জাবী (গুরুমুখী) সাহিত্য সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

'দমদমা সাহিব'

মুখওয়াল দুর্গ ত্যাগ করিবার কালে গুরু—মাতা সুন্দরণ ও মাতা সাহেব দিবানকে কোন বিশ্বস্ত অনুচরের তত্ত্বাবধানে অন্যত্র প্রেরণ

করিয়া মাতা জিতোজীর সহিত চমকৌড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

গুরু-পত্নী

চমকৌড়ে মাতা জিতোজী স্বর্গস্থ হন। তাঁহার সে মৃত্যু কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা আমরা এখনও বিশেষ-রূপ জানিতে পারি নাই। তবে শুনা যায়, মাতা দুর্বৃত্ত মোগলের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ রহস্য এখনও অপ্রমাণিত রহিয়া গিয়াছে। অপর মাতৃদ্বয় দিল্লী গমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। এক্ষণে গুরুর বিজয়বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তৎসহ সম্মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে দমদমা গমন পূর্ব্বক পতি-চরণে প্রণত হন। দীর্ঘকাল ব্যাপী দুঃখ ও বিরহের পর তাঁহাদিগের মিলন হইল। সেই সময় শোকাবেগ রুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া মাতা সুন্দরণ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—'হায়! আজ আমার পুত্রেরা সব কোথায়!' গুরু কোনরূপ বিচলতা প্রকাশ না করিয়া, সহধর্ম্মিণীর শোকাশ্রু মুছাইতে মুছাইতে ধীরভাবে বলিয়াছিলেন—'তাহাদের হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের বিনিময়ে সমগ্র শিখ সম্প্রদায়ের হৃদয় জয় করিয়াছি। তাহারাই সকলে তোমার সন্তান। তুমি তাহাদিগকেই মাতৃস্নেহ বিতরণ কর।'

বচিঁত্র নাটক

দমদমায় অবস্থান কালে গুরু গোবিন্দ 'বচিঁত্র নাটিক' (বিচিত্র নাটক) নামে পরম পূজ্য "দশবাঁ পাদ্শাহ কা গ্রন্থ সাহিবের" ইতিবৃত্ত মুলক অধ্যায়টি রচনা করেন। সংস্কৃতবহুল ভাষায় গোবিন্দ তাহাতে স্বীয় জীবনবৃত্ত অতি সংক্ষেপে 'ছন্দোবন্ধে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শিখগুরুগণ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল রচনা ও কতিপয় ভক্তের রচনা একত্রিত করিয়া

পঞ্চম গুরু এক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহাই পরে 'আদিগ্রন্থ' নামে পরিচিত হয়। শেষে ইহাতে নবম গুরুর স্তোত্রাবলি সম্বদ্ধ করা হয়। কোন অনিবার্য্য কারণে দশম গুরু সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। 'আদিগ্রন্থ' কেবল ভগবদ্‌স্তোত্রমালার সমষ্টি; কিন্তু "দশবাঁ পাদ্‌শাহ কা গ্রন্থে" ভগবদ্‌স্তোত্র ব্যতীত রাষ্ট্রনীতিক আলোচনা ও সাময়িক ইতিহাস সম্বদ্ধ করা হইয়াছে।

গুরুগ্রন্থ

যথাকালে গুরু দমদমা ত্যাগ করিয়া রাজধানী যাত্রা করিলেন। পথে সিরহিন্দ নগর পড়িল। এই পাপ সিরহিন্দের নামে আজও সকলের হৃদয় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। অন্যায় প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া মোগলেরা গোবিন্দ-পুত্রদিগকে হত্যা করায় সিরহিন্দের ইতিহাস—কেবল সিরহিন্দের ইতিহাস নহে, মোগল প্রভুত্বের ইতিহাস—কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। এই হীন সহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য শিখেরা উন্মত্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু ধীর-প্রকৃতি গোবিন্দ তাহাতে বাধা দিলেন। একের পাপে সমগ্র নগরবাসীকে শাস্তি দিতে তাঁহার উদার হৃদয় সম্মত হইল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে পুত্রদিগের শবাধার নগর-প্রাচীরের নিকটে বসিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পুরাতন শোকরাশি উছলিয়া উঠিল। যাহা এতকাল চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ আর তাহা রুদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার গণ্ড বহিয়া তপ্তাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাল-পুত্রদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সকল সংযম, সকল উদ্যম নষ্ট হইয়া গেল। গোবিন্দ সিংহ সাধারণ মনুষ্য হইয়া উঠিলেন।

'গুরুমার' সিরহিন্দ

যে অপূর্ব্ব মানসিক তেজঃ প্রভাবে গোবিন্দ এত কাল কষ্টকে কষ্ট, বিপদকে বিপদ্ বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই, আজ তাঁহার সে তেজ বুঝি লুপ্ত হইতে বসিল। গোবিন্দ ভগ্নমনে সিরহিন্দ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। যাইবার পূর্ব্বে গোবিন্দ নগরটিকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সে অভিশাপ অদূর ভবিষ্যতে ফলবান্ হইয়াছে। এখন আর সে গৌরব-স্ফীত সিরহিন্দ নাই, তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহরাজি ও গৃহ-ভগ্ন-উপকরণে পূর্ণ মার্গনিচয় আজও তাঁহার সে অভিশাপ নীরবে বহন করিতেছে।

অভিশপ্ত সিরহিন্দ

সিরহিন্দ ত্যাগ কালে গোবিন্দ শিখদিগকে আদেশ করেন, যে-কেহ এই ঘৃণ্য সহর অতিক্রম করিয়া গঙ্গা স্নানে যাইবে, যাইবার ও ফিরিবার কালে সে যেন এক এক খণ্ড ইষ্টক যমুনা ও শতদ্রুতে নিক্ষেপ করে; অন্যথা তাহার সে স্নানে কোন ফলোদয় হইবে না। আজও শিখেরা ভক্তিসহকারে এই প্রথা পালন করে।

ইষ্টক-ক্ষেপণ প্রথা

গোবিন্দ সিরহিন্দের একটি নূতন নামকরণ করেন। নামটি ইহার চির অকীর্ত্তির পরিচায়ক। গুরুপুত্রদের হত্যার স্থান বলিয়া গোবিন্দ ইহাকে 'গুরুমার' (বা গুরুর হত্যাকারী) বলিয়া অভিহিত করেন।

'গুরুমার'

নিহত পুত্রদিগের স্মৃতি শিখদিগের প্রাণে চির সজাগ রাখিবার উদ্দেশে গোবিন্দ এই নগরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজও শিখেরা সেই পবিত্র মন্দির সন্দর্শন করিয়া আপনাদিগের গৌরবময় পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত স্মরণ করত নৈরাশ্যের মধ্যে ক্ষীণ আশার জ্যোতিঃ দেখিতে পায়।

পুত্রদিগের স্মৃতিমন্দির

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

জীবন-সন্ধ্যা

যৎকালে গোবিন্দ সিংহ বহুকালের পর পরিত্যক্ত মুখওয়ালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন ঔরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে অবস্থান করিতে ছিলেন। এই সময় চেষ্টা করিলে গোবিন্দ তাঁহার এত দিনের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন—পঞ্জাব স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সেরূপ কোন চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, মানসিক অবসাদই এরূপ আচরণের মূল। গুরু যত বড়ই বীর হউন না, দেবভাব তাঁহাতে যতই অধিক থাকুক না, তিনি ত মনুষ্য। মনুষ্য-সুলভ অবসাদ ও ক্লেশ হইতে তিনি কিরূপে মুক্তি পাইবেন? আজ যদি তাঁহার পুত্রগণ জীবিত থাকিতেন, তবে তাহা কত আনন্দের হইত; তাহা হইলে আজ তিনি আনন্দিত মনে আনন্দপুরে ফিরিতে পারিতেন। কিন্তু আজ আনন্দপুর তাঁহার নিকট নিরানন্দময়। গৃহের শূন্যতা দেখিয়া, পুত্রগণের মৃত্যু কথা ভাবিয়া কোন্ ব্যক্তির না হৃদয় টলে! মানুষ হইলে তাহাকে এ দুঃখে মুগ্ধ হইতে হইবেই। প্রতাপসিংহ বালিকা কন্যার খাদ্য শষ্প-রুটিখানি মার্জ্জার-ভুক্ত হওয়ায়

গোবিন্দের অবসাদ

বড়ই বেদনা পাইয়াছিলেন; সে বেদনা তিনি হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া দিল্লীর অধীনতা স্বীকারে মনস্থ করিয়াছিলেন। অসাক্ষাতে অসহায় বালপুত্রগণের জীবন্ত মৃৎপ্রোথিত হওয়ার নিকট কন্যার অনাহারজনিত ক্রন্দন বোধ হয় তত কষ্টকর, তত জ্বালাময়ী নয়। আজ যাহাদিগকে প্রিয়তম বলিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করি, যাহাদিগের সুমধুর মুখচ্ছবি দেখিলে সমস্ত অবসাদ দূরে পলায়ন করে, সেই পুত্রগণ অকালে মোগলের হস্তে নিঃসহায়ভাবে নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইয়াছে; কল্য আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইব না, তাহাদিগের মধুর বাণী আর কর্ণকুহর তৃপ্ত করিবে না, এ কষ্ট মনুষ্যের পক্ষে অসহ্য। এ অসহ্য কষ্টও গোবিন্দ দমন করিয়া পূর্ণোৎসাহে সৈন্য সংগ্রহ করেন ও মুক্তসরে প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন। তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য কতকটা সফল হইলেও পূর্ণ সাফল্য সন্দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এখনও পর্য্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব স্বাধীন হয় নাই, কিন্তু তৎসাধনে তাঁহার কোন চেষ্টাও নাই।

অবসাদগ্রস্ত গোবিন্দ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াও উপযুক্ত অনুচরের অভাবে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না।

উপযুক্ত শিখ নেতার অভাব

তাঁহার অধীনে এখন পর্য্যন্ত এমন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি সহজেই ও নির্ব্বিবাদে সমগ্র শিখকুলকে পরিচালিত করিতে পারিবেন, যাঁহার আদেশ শিখেরা অম্লান-বদনে মান্য করিয়া লইবে, যিনি গোবিন্দের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন। যতদিন না তেমন নেতৃগুণসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, ততদিন গোবিন্দকে বাধ্য হইয়া রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু তিনি তৎকার্য্যে লিপ্ত হইয়াও পূর্ব্বের

ন্যায় উৎসাহশীল থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণ ক্রমেই শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

এই সময় দাক্ষিণাত্য-প্রবাসী সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব বন্ধুভাবে গুরুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। মুক্তসরের পরাভব-কাহিনী শ্রুত হইয়া সম্রাট্ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বীরই এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয়ে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় গোবিন্দ সিংহ সহজেই সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কূট কৌশলী ঔরঙ্গজেব স্বীয় দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া মিষ্ট ভাষায় ও শিষ্টাচারে গোবিন্দকে শান্ত ও বশীভূত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন; কিন্তু গোবিন্দ তাঁহার সে নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না; প্রত্যুত পারসীক ভাষায় চৌদ্দশত শ্লোকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঁচটি শিখের সহিত সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। পত্রখানি 'হিকায়ৎ জাফরনামা' নামে অভিহিত হইয়া 'দশবাঁ পাদ্‌শাহকা গ্রন্থে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পত্রের শেষাংশে গোবিন্দ লিখিয়াছিলেন—সম্রাটের উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই; খালসা (শিখগণ) এখনও তাঁহার উপর প্রতিহিংসা লইবে। স্বীয় পুত্রহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেন, তাঁহার আর কোন পার্থিব বন্ধন নাই। এক্ষণে তিনি মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। রাজার রাজা সেই একমাত্র সম্রাট্ ঈশ্বরকে ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও ভয় করেন না।

ঔরঙ্গজেবের নিমন্ত্রণ

গোবিন্দের উত্তর

সম্রাট্, গোবিন্দের এই পত্র পাঠ করিয়া বাহ্যতঃ কোন বিরক্তির ভাব না দেখাইয়া শিখ পঞ্চজনের সহিত অতীব ভদ্র

ব্যবহার করেন এবং গুরুকে পুনঃ নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকেই দূতস্বরূপ আনন্দপুরে প্রেরণ করেন ; কিন্তু গোবিন্দ সে নিমন্ত্রণও গ্রাহ্য করিলেন না। গোবিন্দের এই ঔদ্ধত্যের প্রতীকার করিবার পূর্ব্বেই ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে মোগল বংশের শেষ উজ্জ্বল সূর্য্য ঔরঙ্গজেব জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আমেদনগরে চির অস্তমিত হইয়া গেলেন। তখন সহসা চারিদিক্ অরাজকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সম্রাট্-পুত্রগণ সিংহাসন লাভের জন্য আত্মপর বিস্মৃত হইলেন, ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে শাণিত ছুরিকা বসাইতে কিছু-মাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু বৃদ্ধ মুয়াজীম সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভ্রাতৃগণের রক্তে অসি কলঙ্কিত করিয়া 'বাহাদুর সাহ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর রাজতক্তে আরোহণ করিলেন। এই সময় নব সম্রাটের বয়ঃক্রম সাতষট্টি বর্ষ হইয়াছিল।

সম্রাটের মৃত্যুতে অন্তর্বিগ্রহ

এই ভ্রাতৃদ্রোহ কালে গোবিন্দ একান্ত নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। জানি না, তিনি কি ভাবিয়া বাহাদুর সাহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ; কেবল সাহায্য নহে, তাঁহার বশ্যতা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। গোবিন্দের এরূপ আচরণের কারণ কি, তাহা আমরা আদৌ অবগত নহি, কোনরূপ কারণ অনুমান করাও দুষ্কর। এই সাহায্যের ফলে উভয় নরপতির মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি সংঘটিত হয়। সম্রাট্ গুরুকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়া দক্ষিণাপথে প্রেরণ করিবার অভিলাষ জানাইলে, গুরু সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হন।

শিখ-মোগলে পুনঃসম্প্রীতি

পঞ্জাব ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর একবার পার্ব্বত্য রাজন্যবৃন্দের সহিত গুরুর সংঘর্ষ হয়। সে সংঘর্ষে রাজারা ভীষণভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর শিখ-সমাজের যথাবিধি বন্দোবস্ত করিয়া গুরু দক্ষিণাপথে গমন করেন। এই সময় গুরু পত্নীদ্বয়কে পুনরায় দিল্লী পাঠাইবার উদ্যোগ করিলে মাতা সাহিব দিবান কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে সম্মত হইলেন না। তখন গোবিন্দ মাতা সুন্দরণকে দিল্লী পাঠাইয়া মাতা সাহিব দিবানকে সহগামিনী করিতে বাধ্য হন; কিন্তু দাক্ষিণাত্য গমনের অল্পকাল পরেই তাঁহাকেও দিল্লী প্রেরণ করিলেন। দিল্লীতে মাতৃগণ শিখদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বামীর আরাধনায় সর্ব্বদাই নিমগ্ন থাকিতেন। দিল্লী আগমনের কিছু পরেই মাতা সাহিব দিবান মরলোক ত্যাগ করিয়া স্বামীর আত্মার সহিত মিলিত হন; কিন্তু মাতা সুন্দরণ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সন্তানবৎ শিখদিগের উন্নতির জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পঞ্জাব ত্যাগ

গুরুপত্নী

শেষ জীবনে গোবিন্দ তাঁহার সাধের পঞ্জাব কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার বশ্যতাস্বীকারের ন্যায় অন্ধ তমসাচ্ছন্ন। কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা কি জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহাও আজ জানা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, তিনি মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে সম্রাটের যথেষ্ট কূট কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। শিখে-মারাঠায় যুদ্ধ হইলে, ক্ষতি শিখ-মারাঠারই, পক্ষান্তরে জয়ফল ভোগ করিবে মোগল। কিন্তু সুখের

পঞ্জাব-ত্যাগের কারণ

বিষয়, গোবিন্দ তথায় গমন করত কোন যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে এক বৈরাগীর সহিত গুরুর সাক্ষাৎ ঘটে। বৈরাগী কেবল ধর্ম্মতত্ত্বই বুঝিতেন না, যুদ্ধ-বিদ্যাতেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। গুরুর সহিত আলাপ করিয়া তিনি গুরুর মহত্ত্বে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আপনাকে 'বান্দা' * বা 'শ্রীগুরুর দাস' বলিয়া পরিচিত করেন। বান্দাকে শিখশক্তির অধিনায়কত্বের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গুরু তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করিতে থাকেন। শিখদিগের ধর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তিনি কতিপয় বিধি প্রণয়ন পূর্ব্বক ইতিপূর্ব্বেই স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ কতিপয় গুরুমঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। গুরুগ্রন্থ পরিবেষ্টিত পঞ্চ খালসার সম্মিলনকে 'গুরুমঠ' বা 'সঙ্গত' বলে। গুরুর অবর্ত্তমানে এইরূপ সমিতিই শিখদিগের ধর্ম্মগতি পরিদর্শন করিবে। ফলতঃ, গুরুমঠ কার্য্যতঃ ধর্ম্ম-গুরুর পদ প্রাপ্ত হয়। গোবিন্দের ইচ্ছা ছিল, বান্দাকে শিখরাজরূপে বরণ করিয়া পঞ্জাব স্বাধীন করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন। শিখদিগের ধর্ম্ম-নীতির উপর তাঁহার কোন হস্ত থাকিবে না।

শিখনেতা বান্দা

ক্রমে গুরুর অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গুরু যেন পূর্ব্বেই তাহার আভাস পাইয়া এক পর্ণ কুটীরে সাধু ও শিষ্যগণ

* ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকই ভ্রমক্রমে বান্দাকে 'বন্ধু' করিয়াছেন।

পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে শেষ দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাঠান যুবকের গুরু-হত্যার চেষ্টা

এমন সময় একদিন এক পাঠান গুপ্তভাবে তাঁহার হৃদয়ে একটি ছোরা বসাইয়া দেয়। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যেই সে এরূপ ভীষণ কার্য্যে প্রলুব্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। যাহা হউক, তাহার সে আঘাতে গুরুর দেহাবসান হইল না। সুচিকিৎসকের শুশ্রূষা প্রভাবে তিনি ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিলেন। কিন্তু আর বুঝি তাঁহার জীবিত থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। ক্ষতমুখ সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই গুরু একদা একটি ধনুঃ লইয়া তাহাতে জ্যা আরোপণের চেষ্টা করেন। এরূপ অন্যায় চেষ্টায় ক্ষতমুখ আবার ফাটিয়া গেল, অজস্রধারে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখনি তাহা পুনরায় বাঁধিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ক্রমেই গুরুর যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি আসন্ন মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া পাল্কীতে আরোহণ করত গোদাবরী তটস্থিত নদেড় সহরে উপস্থিত হইলেন। তথায় গুরু আপনার আশু দেহত্যাগের কথা শিখদিগকে জ্ঞাত করিলেন। তথায় কয়েক দিন একরূপ কাটিয়া গেল। কিন্তু যন্ত্রণার কোন উপশমই হইল না। গুরু ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে তথায় এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও সাধু ফকিরদিগকে অন্নবস্ত্র বিতরণ করা হয়। পরে এক দিন গুরু স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধানের জন্য কাষ্ঠ ও বস্ত্রাদি সংগ্রহের আদেশ করিলেন। আদেশ করিয়াই গুরু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। শেষ-সময় উপস্থিত দেখিয়া শিখেরা চন্দন কাষ্ঠের একটি সুন্দর চিতা সাজাইয়া সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

শেষ দিন

মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বে আবার চেতনা হইল। তখন তাঁহার আদেশে তাঁহাকে স্নান করাইয়া নব বস্ত্রে ভূষিত করা হইল। তাঁহার সেই পার্থিব দেহ অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হইল। তিনি বলিলেন—'আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র খুলিয়া লইও না। এই সমস্ত শুদ্ধ আমায় দাহ করিও।' অতঃপর গুরু উঠিয়া বসিলেন ও একমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

গুরুর শেষ আদেশ

'পরমেশ! তোমার চরণকমলে আশ্রয় লইয়া অবধি আমি আর কিছুই বড় দেখি নাই। পুরাণে-কোরাণে কত কথা বলে, কিন্তু তাহাদের কোন কথাই আমার তৃপ্তিদায়ক হয় নাই। স্মৃতি, শাস্ত্র ও বেদে তোমাকে পাইবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থার কথা বলিয়াছে ; কিন্তু আমি সে বিভিন্নতা বুঝিতে পারি নাই। হে দয়াল! যাহা কিছু দেখিয়াছি, যাহা কিছু ভাবিয়াছি, সকলই তোমার জানিয়াছি—আমার বলিয়া ত' কিছুই ভাবি নাই।'

এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নরদেব শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ নরদেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তখন সমবেত শিষ্যেরা ও সাধু মহাত্মাগণ 'জয়জয়কার' করিয়া উঠিলেন ও একটি হৃদয়ব্যঞ্জক গীত গাহিতে গাহিতে কাঁদিতে লাগিলেন। সাধুর মৃত্যুতে আজ কঠোরব্রতী সন্ন্যাসীর হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল, তাঁহাদিগের সে কঠোর সংযম ভাঙ্গিয়া অশ্রুরাশি বহিতে লাগিল।

দেহত্যাগ

দশম বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষ কাল অবিরত শিখ-সমাজের পবিত্র সেবায় আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়া শ্রীগুরু

গোবিন্দ সিংহ ১৭৬৫ বিক্রম সম্বতের (১৭০৮ খৃঃ) কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দেহত্যাগ করেন। তৎপ্রদর্শিত পবিত্র পন্থা অবলম্বন করিয়া উত্তর কালে শিখ-সমাজ স্বাধীন রাজ্যস্থাপনে পারগ হইয়াছিল।
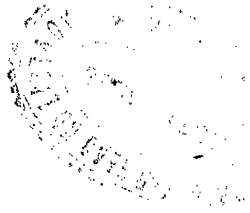
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চরিত্র ও শিক্ষা

গোবিন্দ তাঁহার স্বল্পকালব্যাপী জীবনের মধ্যে দেশের এক মহোপকার করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান পাটনা আর্য্যবীরদিগের লীলাস্থল ছিল, ভাগীরথী তাহার পদধৌত করিয়া ধন্যা হইয়াছেন।

নব ভাবের উদ্বোধন

যে পুণ্যভূমি পঞ্জাবের প্রত্যেক গ্রামটি পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের পবিত্র শোণিতে অভিষিক্ত, সেই পঞ্জাবে বর্দ্ধিত হইয়া গোবিন্দ আর্য্যতেজে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যের গুরু হইয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, অবস্থা বিশেষে ধর্ম্মরাজকেও শাণিত কৃপাণ-হস্তে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইতে হয়—তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থার সহিত দেশের ধর্ম্মভাবেরও অনেকটা সংযোগ আছে। রাষ্ট্রীয় অবনতির সহিত দেশের ধর্ম্মেরও অবনতি ঘটে, ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; তাই তিনি কেবল ধর্ম্ম প্রচারেই আপনাকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্মভাব-বিমিশ্রিত এক নবীন সামরিক জাতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এরূপ উদ্যম জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। ধর্ম্মসম্প্রদায় কি করিয়া সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে পারে, তাহা গোবিন্দ সিংহ তাঁহার জীবনে দেখাইয়াছেন। পিতামহ হরিগোবিন্দ যে কার্য্যের

পত্তন করিয়াছিলেন, আজ গোবিন্দ সিংহ সেই কার্য্য সম্পূর্ণভাবে সাধন করিলেন।

স্বার্থত্যাগ

যে উদ্দেশ্য লইয়া গোবিন্দ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যাইয়া তাঁহাকে যেরূপভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সেরূপ স্বার্থত্যাগ কোন কালে কোন ব্যক্তিই করে নাই। পিতা তেগ বাহাদুর ধর্ম্মরক্ষা করিতে যাইয়া স্বেচ্ছায় মোগলের হস্তে নিহত হইয়া পুত্রের প্রাণে যে স্বার্থত্যাগের উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলেন, সে উদ্দীপনার বলে গোবিন্দ সিংহ স্বীয় অবস্থা ভুলিয়াছিলেন, স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ভীষণ যজ্ঞের বলিরূপে উৎসর্গ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। গোবিন্দ শিষ্যদিগকে বারবার বুঝাইয়াছিলেন—'বীরের ন্যায় মরাই মনুষ্যের বাঞ্ছনীয়, তোমরা বীরের ন্যায় মরিতে শিখ।' তিনি ধর্ম্মরাজ্যের গুরু হইয়াও শিখাইয়াছিলেন—

'জয়ো বধো বা সংগ্রামে ধাত্রাদিষ্টঃ সনাতনঃ।
স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈব কার্পণ্যং ন প্রশস্যতে॥

—সংগ্রামে জয়লাভ বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই বিধাতার সনাতন বিধি। সধর্ম্মপালনে কাতরতা প্রদর্শন করা ক্ষত্রিয়ের শোভা পায় না।' তিনি আরও বুঝাইয়াছিলেন—

'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

—যদি হত হও, পরলোকে স্বর্গ-সুখের অধিকারী হইবে, আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও, তবে এই বিশাল ধরা তোমারই ভোগ্য হইয়া উঠিবে।' শিখদিগকে এইরূপভাবে শিক্ষিত করিয়াই গোবিন্দ দেশের নবযুগ আনিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গোবিন্দ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে সকলই মহৎ, সকলই পবিত্র। তাঁহার জীবনে কখন কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখা যায় নাই। কৃতঘ্নতার কলঙ্ক তাঁহাকে কখন স্পর্শ করে নাই। উপকারীর উপকার করিতে, উপকার স্মরণ রাখিতে, তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার স্রোত ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইত। তাই তিনি তাঁহাকেই হত্যা করিতে প্রবৃত্ত পাঠান যুবককে কোনরূপ শাস্তি না দিয়াই ছাড়িয়া দেন; বলিয়াছিলেন— 'কি করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে হয়, এ যুবক তাহা আমায় শিখাইয়াছে।' মৃত্যুকালেও গোবিন্দ স্বভাবসুলভ উদারতা ভুলিতে পারেন নাই।

উদারতা

অত্যাচারী রাজার চক্ষে তিনি অদম্য বিদ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির প্রশংসা সকলকেই করিতে হইয়াছে। তিনি দেশকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন, তাই তিনি দেশের ধর্ম্মরক্ষার জন্য,— স্বাধীনতা আনয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ পবিত্র চেষ্টাকে পররাজ্য-লিপ্সা বলা যায় না—বলিলে মহাপাপ হয়। তাঁহাকে পররাজ্য-লিপ্সু বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারিব না, তাঁহার হৃদয় কত উচ্চ, তাঁহার জীবন কত মহৎ, তাঁহার কর্ম্মবৃত্তি কত পবিত্র, তাহা বুঝিতে পারিব না। যাহা আমার, তাহা ন্যায়তঃ চিরকালই আমার। বর্ত্তমান দৌর্ব্বল্য বা অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমার দ্রব্য পরহস্তগত হইতে পারে, কিন্তু যখন আমি আমার প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিচয় পাইয়া

স্বদেশ-হিতৈষণা

স্বীয় দ্রব্যাধিকার করিতে প্রয়াস পাইব, তখন আমার সেই উদ্দেশ্যকে পরদ্রব্য-লিপ্সা বলিয়া অভিহিত করা বাতুলতারই পরিচায়ক। গোবিন্দও সেইরূপ পররাজ্য-লিপ্সু ছিলেন না। তিনি দেশের জন্য পাগল ছিলেন, দেশকে পাগলের মত সমগ্র হৃদয় দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, দেশের জন্য তিনি আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন। এরূপ ভাবে দেশকে ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে কয় জন পারে?

ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্র শক্তির অপূর্ব্ব সংযোগ

গোবিন্দে আমরা ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির সংযোগ দেখিতে পাই। এই সংযোগ বড় পবিত্র। ব্রাহ্মণ রূপে তিনি শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাদের পারমার্থিক মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আবার ক্ষত্রিয় রূপে তাহাদিগকে দেশের অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে, সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া জগতে 'মাথা তুলিয়া' দাঁড়াইতে শিখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ রূপে তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন যে, 'শিখগণ দেশের ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের কষ্ট দূর করিবার জন্য জন্মিয়াছে, এই বিশ্বাসে সকলে অনুপ্রাণিত হও।' ক্ষত্রিয় রূপে বুঝাইয়াছেন, 'দেশের স্বাধীনতা না থাকিলে দেশের ধর্ম্ম, দেশের রীতিনীতি সম্যক্ রক্ষা পায় না।'

অবস্থার সহিত ঘোর সংগ্রাম

কার্য্য-সাধনের জন্য গোবিন্দকে যেরূপভাবে অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, এরূপভাবে সংগ্রাম, বোধ হয়, আর কেহ করে নাই। যাহাদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, কার্য্যকালে তাহারা একে একে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলাইল—তিনি নিরুপায় নিঃসহায় হইয়া কাঙ্গালের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন।

তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গও সময় সময় তাঁহাকে আশ্রয় পর্য্যন্ত দেয় নাই, সামান্য একটি অশ্ব দিয়াও উপকার করে নাই। কিন্তু এত কষ্ট পাইয়াও বীরের অদম্য হৃদয় দমে নাই। যে হৃদয়ে পুত্র-শোক-বহ্নি জ্বলিয়াছে, যে হৃদয় গুরুপদের মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, সে হৃদয় সহজে টলিবার নহে। যখন কঠোর তপস্যার পর ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন, যখন মুক্তসরের যুদ্ধে গুরু প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিলেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল ; কষ্টে যে হৃদয় ভাঙ্গে নাই, সুখের সময় তাহা অবসাদে পূর্ণ হইল। কার্য্যাবসানে তিনি আত্মীয়দিগের জন্য তপ্তাশ্রু ফেলিয়াছিলেন ;—যতক্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অশ্রু দেখা যায় নাই।

অবসাদগ্রস্ত হইয়া গোবিন্দ আর কিছু করিতে পারেন নাই। শেষ জীবনে তিনি মোগলের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ দাসত্ব গ্রহণে যে কোন মহদুদ্দেশ্যই লুক্কায়িত থাকুক না, তাহাতেই তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমিক ঐতিহাসিকের চক্ষে প্রতাপ সিংহের নিম্নে আসন দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু প্রতাপের অপেক্ষা তিনি অধিক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, দেশের জন্য প্রতাপের অপেক্ষা অধিক ও মূল্যবান্ দ্রব্য উৎসর্গ করিয়াছেন, দেশের জন্য গোবিন্দ নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন, একথা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু প্রতাপ কখনও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, সর্ব্বক্ষণই আপনাকে মহারাণা ভাবিয়া উত্তেজিত হইয়াছিলেন। এজন্য প্রতাপ তাঁহা অপেক্ষা উচ্চতর আসনের অধিকারী হইয়াছেন।

প্রতাপ ও গোবিন্দ

যোগলেরা প্রতিহিংসা নিবৃত্তির জন্য তাঁহার উপর নৃশংস

অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই ; কিন্তু বীরহৃদয় গোবিন্দ সুযোগ পাইয়াও সেরূপ নৃশংসভাবে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন নাই ;—তাঁহার উদার হৃদয়ে সর্ব্বদা ক্ষমার অধিষ্ঠান ছিল। তিনি মোগলদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন ; তাই সিরহিন্দ তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিল। প্রতি কার্য্যে তিনি স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গুরুজনোচিত গাম্ভীর্য্য ও স্থৈর্য্য তাঁহাতে সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিল। আজ তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হউক—তাঁহার কর্ম্মবৃত্তির মহত্ত্ব ভাবিয়া সকলে তাঁহার চরণে প্রণত হউক। তাঁহার সেই মহতী শিক্ষা আমাদের জ্ঞানশক্তিকে ও হৃদয়বৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তুলুক—

ক্ষমাশীলতা

“বিপদে অভয়, জীবনে বিজয়
কেবা কোথা আর যাচিবি ?
সাধনার পর নির্ভর কর্,
এ জগতে যদি বাঁচিবি ॥”

শ্রীবাহি গুরুজী কী ফতহ্।

পরিশিষ্ট

শিখগুরুদিগের ক্রমানুবর্ত্তিক বংশ-তালিকা।
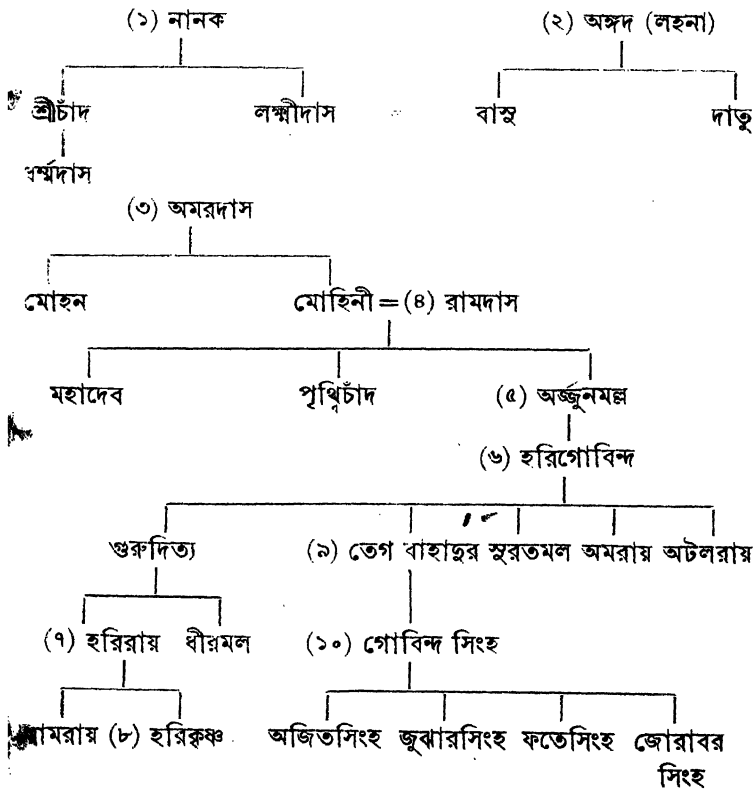
গুরু গোবিন্দ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

আপনার গুরুগোবিন্দ পড়িয়া সুখী হইলাম। বাঙ্গলায় আদিম ও প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লেখা একটি সুমহৎ এবং স্থায়ী মূল্যের কার্য্য। ইহাতে আপনি বেশ সফলতা লাভ করিয়াছেন। বইখানিও সুখপাঠ্য হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল বাঙ্গলা লেখক লেপল গ্রিফিণের রণজিত সিংহ ও কানিংহামের গ্রন্থ সম্বল করিয়া 'ঐতিহাসিক' প্রবন্ধ রচনা করিতেন, তাঁহারা আপনার গুরুগোবিন্দে প্রকৃত আদর্শ দেখিবেন এবং থমকিয়া যাইবেন, এরূপ আশা করা অন্যায় হয় না।

প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩১৬

ইহাতে শিখ দশম গুরু গোবিন্দ সিংহজীর বিশদ জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ অনাড়ম্বর। রচনা বেশ শৃঙ্খলা-সম্পন্ন। শিখগুরুর মহৎ চরিত্র রচনার গুণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বহু জ্ঞাতব্য কৌতূহলোদ্দীপক খুঁটিনাটি কাহিনী পুস্তকখানিকে সুখ-পাঠ্য করিয়াছে। পড়িতে আরম্ভ করিলে ছাড়া যায় না। খুব সংযত সাবধানতায় লেখা। বালকবালিকারাও স্বচ্ছন্দে পাঠ করিয়া উপকৃত হইবে। ইহাতে গুরু গোবিন্দ সিংহের চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের উপাদেয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে।